কালিদাস রায়ের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

কালিদাস রায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

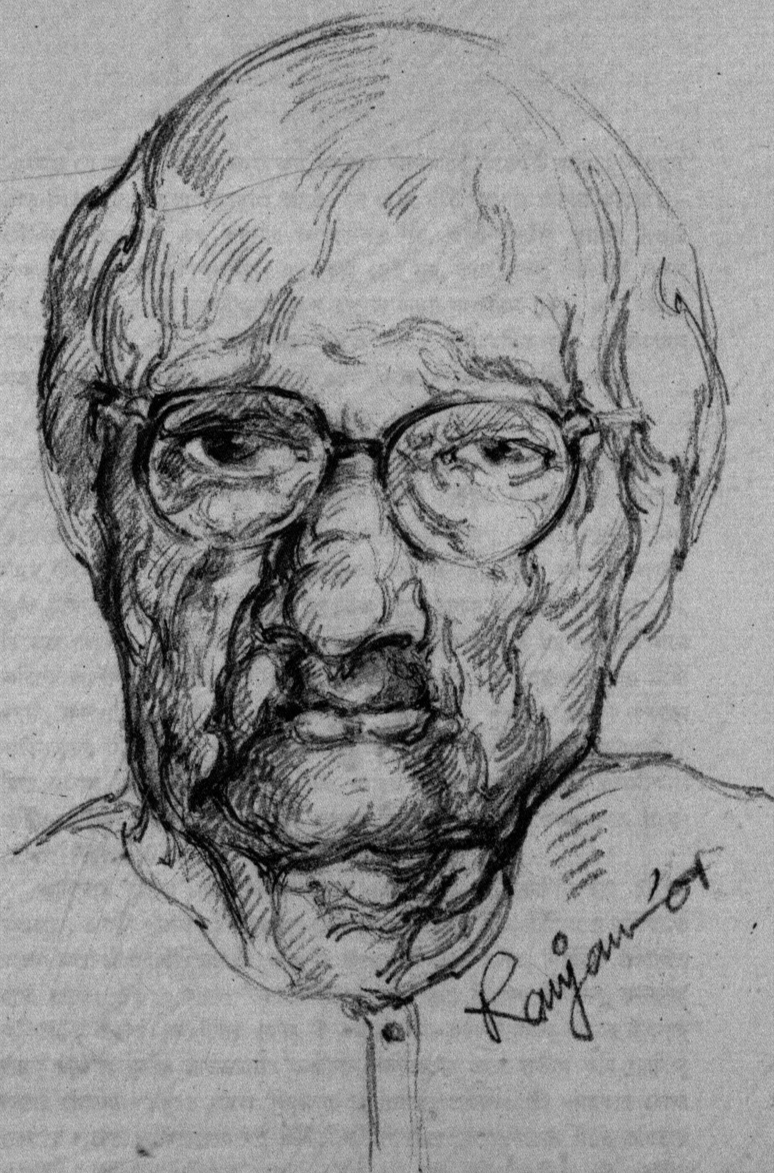
গোরা সিংহরায়
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।



'এখনও যে কবিতা প্রাণের ভাষা কয়, সে ওই আপনারই কয়েকটি কবিতা,—তাতে পিতৃ-পিতামহের আত্মার আকুতি আছে; সে হচ্ছে খাঁটি বাঙালি প্রাণের কবিতা;— সৌন্দর্যের রসাবেশ নয়, কল্পনার অলকা-স্বপ্ন নয়, কাব্য-সুন্দরীর স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদের অপূর্ব কৌশল নয়। এখন চাই সেই সুর, যাতে সকল অভিমান, সকল গর্ব দূর হয়, প্রাণের তুলসীমূলে দীপ জ্বেলে সন্ধ্যা-সংকীর্তন-শেষে, এই আমার দেশের মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।' সমসাময়িক কবি মোহিতলাল মজুমদারের এই প্রশস্তি কালিদাস রায়ের সৃষ্টিকে যথার্থ আলোকিত করে।

২.

কালিদাসের কবিতা লেখার শুরু বহরমপুরে লন্ডন মিশনারি স্কুলে এবং আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে পড়ার সময় তাঁর আত্মীয় রাধিকাচরণ বরাটের কাছে। তাঁরই উদ্যোগে কয়েকটি কবিতা নিয়ে 'কুন্দ' নামে প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ (১৯০৮ সালে)। নিজ নামে উৎসর্গিত সেই গ্রন্থটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কাঁচা বয়সের লেখা'র স্তুতি-নিন্দার দিকে দৃক্‌পাত না করে 'অবহিত ভাবে সাধনা' করতে। নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অক্ষয়চন্দ্র, অশ্বিনীকুমার এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে কবিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের ভাষায় : 'ক্ষুদ্র অণুপ্রমাণ বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতির জীবনৈশ্বর্য নিহিত থাকে ...এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তেমনি একজন ভবিষ্যতের সাহিত্যরথীর জীবনাঙ্কুর ও মুকুলিত শক্তি নিরীক্ষণ করিতেছি।' দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দেখেছিলেন : এই কাব্যে ছন্দোমাধুর্য আছে। রজনীকান্ত জানিয়েছিলেন . তরুণ কবির সেই লেখা তাঁর 'রোগশয্যায় বেদনা-ক্ষতে স্নিগ্ধ-প্রলেপ দিয়েছে।

কালিদাস রায়ের প্রথম কবিতা 'মেঘ ও ময়ূর' অবশ্য প্রকাশিত হয় ১৯১৩ অগ্রহায়ণ ভারতী পত্রিকায়। কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে তিনি রীতিমতো কবিখ্যাতি অর্জন করেন। প্রবাসী, ভারতী, জাহ্নবী, উপাসনায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩২০ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটির প্রকাশ। কলেজের রেভা. ই এম হুইলার এবং সাময়িক পত্রের উৎসাহ তাঁকে উদ্দীপ্ত করে। স্নাতকোত্তর অধ্যয়নে কলকাতায় এসে সতীর্থ কবি শরদিন্দু রায়ের প্রেরণায় ১৯১১ সালে 'কিশলয়' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। এই সময়কার লেখা যেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড-কবিতা ও অক্ষয়চন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার প্রভাবিত। 'ভারতী' পত্রিকার মতে : 'খুব বড় দক্ষ কারুকর-ভিন্ন এই শ্রেণীর Epigrammetic কবিতা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। নবীন কবি কালিদাস এই

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।' দেবেন্দ্রনাথ সেন এক কবিতায় লেখেন, 'তোমার সৌন্দর্যকুঞ্জে যতবার পশি আমি, কবি!/হেরি তথা শোভা নব নব!/গলাগলি করি তথা হাসে চাঁদ আর বালরবি।/অফুরন্ত ফুলের বৈভব।' ['কবি কালিদাস রায়ের প্রতি']

১৯১১ সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মেরি গোল্ড ক্লাবের সদস্য হিসেবে তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখের আনুকূল্য লাভ করেন। ১৯১৪ সালে বরিশালের দেবকুমার চৌধুরির অর্থানুকূল্যে বন্ধুগণের চেষ্টায় তাঁর 'পর্ণপুট' (প্রথম খন্ড) প্রকাশিত হয়। সেকালের সর্বত্র গ্রন্থটি ব্যাপক সমাদৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের/অন্ন নাহিক জুটে,/যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে/নবীন পর্ণপুটে।' মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত লেখেন, 'মনে হইল স্বর্ণপুট নাম রাখা হইল না কেন? পরক্ষণেই মনে হইল জগতের চিত্তহারিণী মাধুরী পর্ণে? না স্বর্ণে? পল্লী-কবিতা ও জীবন-গীতি পাঠ করিয়া পর্ণপুট নামই যথার্থ মনে হয়'। প্রভাতকুমারের প্রশস্তি : 'পর্ণপুটের স্থলে-স্থলে পড়িতে-পড়িতে গা শিহরিয়া ওঠে। চোখে জল রাখা দুষ্কর হয়।'

পরের কাব্যগ্রন্থ 'বল্লরী'র (১৯১৫) অধিকাংশ কবিতাই 'কুন্দ' ও 'কিশলয়' কাব্যগ্রন্থের কবিতারই মার্জিত-রূপ।

'বজ্রবেণু' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূলে। বিষয়বস্তু ব্রজলীলা এবং তা রবীন্দ্রানুসারী। তৎসত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরির মুগ্ধতা : 'আধুনিক কবিকুলে তুমিই একমাত্র ব্রজকবি, তোমার বিশেষত্ব,—তুমি ব্রজের মধ্যে ব্রহ্মান্ড দেখিয়াছ।'

ষড়ঋতুর রূপ-বৈচিত্র্য সম্পর্কে খন্ড-কবিতার সমাহার 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১৬)। এখানে বিচিত্র ছন্দে কবি ষড়ঋতুর সঙ্গে বাঙালির অন্তরের যোগসাধন করেছেন।

পর্ণপুট (দ্বিতীয় খন্ড) এবং প্রথম খন্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯২১ ও ১৯৩৪ সালে। বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থটিই পাঠক-সমাজে সর্বাধিক সমাদৃত। হিতবাদী পত্রিকার মতে : এর 'পল্লী-কবিতাগুলি পড়িতে-পড়িতে চোখে জল আসে, বৈষ্ণব কবিতাগুলি মর্মস্পর্শী ও সুমধুর।' গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণের মুখপত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি : 'মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে/রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে/উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে/তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।' এর মধ্যে 'ক্ষুদকুড়া' (১৯২৩), 'রসকদম্ব' (১৯২৩), 'লাজাঞ্জলি' (১৯২৫) ও 'চিত্তচিতা' (১৯২৭) প্রকাশিত হয়। 'ক্ষুদকুড়া'য় রয়েছে অনেকগুলি প্রেমের কবিতা, পল্লীকবিতা ও ইংরেজি কবিতার অনুবাদ : হাসির গান ও প্যারডির সংকলন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্মরণে নিবেদিত কবিতাবলী, 'চিত্তচিতা'।

কবিশেখরের লেখা সমস্ত ধরণের কবিতার নির্বাচিত সংকলন : আহরণী (১৯২৮), আহরণী (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩০); প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে, হৈমন্তী (১৯৩৪), বৈকালী (১৯৪০), আহরণ (১৯৫০)। 'হৈমন্তী'র পরিচায়িকায় কবি লিখছেন, 'এগুলি অধিকাংশই আমার জীবনের হেমন্তের ফসল। ... এ বয়সে রসোপকরণ আর বড় জুটে না—এখন স্মৃতিই সম্বল। অধিকাংশ কবিতাই তাই স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, স্মৃতি দিয়ে গড়া।'

পরের কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যামণি' (১৯৫৮) যেন কবির মানসজীবনের বিবর্তন ও বিকাশের দিক-নির্দেশক। এতে এই কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত কবিশেখরের সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা দুটি কাল-পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। কবির কথায় : 'পঞ্চাশ বৎসর আগে 'কুন্দে' যে-খেয়ালের সূত্রপাত হয়েছিল, সন্ধ্যামণিতে বোধহয় তার শেষ হল। ফুলে শুরু ফুলেই সারা, ভাবিওনি ফলের কথা'।

'দন্তরুচি-কৌমুদী' ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এর অধিকাংশ কবিতা ও গানই 'রসকদম্ব'-এ ছিল 'বেতালভট্ট' উপনামে। কিছু কবিতা ষষ্ঠীমধু থেকে গৃহীত। এই গ্রন্থে তৎকালীন রঙ্গব্যঙ্গের শর-সন্ধান।

মধ্যে কবিশেখরের কয়েকটি শিশুপাঠ্য কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। যেমন: গাথাঞ্জলি (১৯৬১), গাথা-কাহিনী (১৯৬৪), তৃণদল (১৯৭০), গাথামঞ্জরী (১৯৭৪), মনীষী-বন্দনা (১৯৭৬), গাথাবলী (১৯৭৮)-প্রভৃতি। কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে প্রমথনাথ বিশীর সম্পাদনায়।

'পর্ণপুট'-এ সজ্জিত, 'ব্রজবেণু'তে ধ্বনিত, 'আহরণ'-'আহবণী'তে আহৃত, 'বৈকালী'তে নিবেদিত, 'সন্ধ্যামণি'তে অধিবাসিত বিবিধ সারস্বত-উপচারে আহুতি-অর্পণের অন্তে অবশিষ্ট হব্য-সম্ভারে কবিশেখরের 'পূর্ণাহুতি' ১৯৬৮ সালে। জীবনের শেষ দিকের রচনার সঙ্গে পূর্ববর্তী কিছু-কবিতার সংকলন 'দিন-ফুরানোর গান' : প্রকাশকাল ১৯৮৪।

কবিশেখরের ক্ষুদ্র কবিতাগুলি যেন রসবিন্দু। এই বিন্দু-বিন্দু সৃষ্টি নিয়েই রচিত হয়েছে সাহিত্য-ছন্দের মহাসিন্ধু 'কাঁটা-ফুলের গুচ্ছ' (১৯২২)।

ভগবান বুদ্ধের একান্ত উপাসক ছিলেন কবি কালিদাস রায়। নিস্পৃহ-কর্ম, শান্ত-সৌম্য জীবন-যাপন এবং অনন্ত-পুণ্যেরই উপাসনার ফলশ্রুতি বৌদ্ধ-সংস্কৃতির কাব্য তথাগত (১৯৯৪)।

৪.

প্রমথনাথ বিশীর মতে : 'কবিশেখরের কবিতায় এমন ভাবের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা ও হাসির তির্যক-ছটা আছে যে পরিণত মনের গ্রহণযোগ্য বিষয়। ... রবীন্দ্রজীবনকালে যে কয়জন Major কবির উদ্ভব হয়েছে নিঃসন্দেহে কবিশেখর তাঁদের অন্যতম।' (কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা) সৃষ্টির স্বকীয়তা ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে তিনি অবশ্যই বরণীয়। রবীন্দ্র-প্রভাবের জ্যোতির্ময় আকাশেও তিনি স্বকীয় প্রভায় উজ্জ্বল। রবিরশ্মির দিব্যসভা নয়, তাতে গৃহদীপের স্নিগ্ধতা আছে। 'সন্ধ্যামণি'র নিবেদনেই কবির উক্তি : 'রচনারীতির বৈশিষ্ট্যই কবির আসল বৈশিষ্ট্য। কারও, এমনকি কবিগুরুর রচনারীতিও আমি জ্ঞাতসারে অনুকরণ করিনি।' মোহিতলাল মজুমদারের মতে তাঁর কবিখ্যাতির কারণ দুটি : 'প্রথম—তাঁর-কবিতার অজস্রতা, অনর্গল প্রবাহ; দ্বিতীয়—প্রাচীন বাংলা ও পল্লী-বাংলার কাব্য-স্মৃতিকে এক নতুন ভঙ্গিতে, নতুন সুরে ও নতুন ভাষায় সঞ্জীবিত করা'।

স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্ম ও নীতির প্রতি আকর্ষণ, পারিবারিক জীবনের প্রীতি মমত্ব, লাঞ্ছিত-বঞ্চিতের প্রতি সহমর্মিতা, দেশাত্মবোধ, পৌরাণিক বিষয়ের নব-ব্যাখ্যান, অতীত ভাবধারার অনুসৃতি, বৃন্দাবনী-পরিমন্ডলে অনুরক্তি,

বিদ্যার্থীদের প্রতি স্নেহ: কালিদাস রায়ের কাব্য-সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে সূক্তিমূলক (Epigrammatic) কবিতা, রঙ্গরসের কবিতা, নীতিমূলক এবং গাথা-শ্রেণীর কবিতা, রূপক (Allegorical) ও সাংকেতিক (Symbolical) কবিতা, শিশুরঞ্জন কবিতা, সংস্কৃত ও ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ সর্বত্রই সিদ্ধহস্ত তিনি। তাঁর অধিকতর বৈশিষ্ট্য ছন্দ, চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য ও তথ্য-সমাহারে।

কবিশেখর ছায়া-ঘেরা শ্যামলস্নিগ্ধ পল্লী-বাংলার কবি। কেবল মমতা নয়, প্রকৃতির রূপচিত্রণেই তাঁর অসাধারণত্ব। বাংলার পল্লীর অন্তর-বাইরের রূপমাধুরী তাঁর অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক স্বীকৃতি : 'তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তোমার মনটি কানায়-কানায় ভরা—সেই ভালোবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও-বা মেদুর কোথাও-বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়া-শীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।' কবির পল্লী-কবিতা : ছায়া, বাংলার দীঘি, শরতের গ্রামপথে, পল্লী-শ্রী, ষষ্ঠীতলা, রেবা-রোধসি, বর্ষা, পালামৌ, পল্লীসন্ধ্যা-প্রভৃতি অজস্র সৃষ্টিতে তার প্রমাণ রয়েছে। মূলত পল্লীকবি-হিসেবে পরিচিহ্নিত হলেও কবি তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন শহরে। তাই তাঁর যথার্থ পরিচয় রয়েছে একটি কবিতায় : 'পুরা নাগরিক নই,/নগবের উপকণ্ঠে 'সন্ধ্যার কুলায়ে' আমি রই/বাড়ির সম্মুখে মোর পিচঢালা পথ/চলে তায় অবিরত কলে-চলা রথ।/পশ্চাতে কদম্ব-আম্র-নারিকেল-বকুলের ছায়া/সৃষ্টি করে পল্লীবনমায়া।/কাঁচা পথ গোরুর বাথান,/ঘুঁটেবালীদের কুঁড়ে, জঙ্গলা বাগান।' পল্লী ও শহরের মিলনেই রচিত হয়েছে তাঁর কাব্যের প্রেক্ষাপট।

নর-নারীর প্রেম-বিরহ, জ্ঞান-অজ্ঞান, বিদ্যা-অবিদ্যা, সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু সর্বত্রই একই বিশ্বলীলার তরঙ্গ-ভঙ্গ। মহামানবের মধ্যে যা সার্বজনীন যা সহজ-সরল আদিম ও চিরন্তন, তাই পরম সত্য। শুধু মানব-প্রকৃতিতে নয়, বিশ্ব-প্রকৃতিতেও সহজলীলা অনাদিকাল থেকে অনন্তকালে প্রবাহিত। বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবিগণের সার্থক উত্তরসাধক কালিদাস রায়। পর্ণপুট, ব্রজবেণু, ব্রজবাঁশরি-কাব্য আমাদের যেন সেই ভাবরাজ্যে উত্তীর্ণ করে। হয়তো বৈষ্ণবকবি লোচন দাসের বংশে জন্ম বলেই তাঁর বহু কবিতার উপজীব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এ-প্রসঙ্গে কবির বৈষ্ণবীয় দীনতা : 'শ্রীকৃষ্ণের কথা আমি আকৈশোর অনেক লিখেছি; কিন্তু তা শুধু ছন্দ-শিল্পের নৈবেদ্য রচনা, তাতে ভক্তির তুলসীপাত্রটি ছিল না। শুধু ভগবান করুণা করে তাঁর চরণপদ্মতলে আমাকে দীর্ঘকাল ধরে আশ্রয় দিয়েছেন।'

রবীন্দ্রপ্রতিভা মূলত রোমান্টিক। গার্হস্থ্য রস তার বিপরীত। অন্যদিকে ছন্দোমিলের সর্বার্থসিদ্ধি সত্ত্বেও গার্হস্থ্য-রসের গুণে কালিদাস রায় স্বতন্ত্র। তাঁর বৈকালি, লাজাঞ্জলি, পর্ণপুট, হৈমন্তী, ক্ষুদকুঁড়া কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় তার প্রকাশ। বাঙালি গৃহস্থঘরের সকল বেদনা, মাধুরী, আনন্দ-উল্লাস, দুঃখ, শোক এই-সমস্ত কবিতায় বর্ণিত। যেমন: কৃষাণীর ব্যথা, কুড়ানি, হা-ঘরে, কেরানির বানী-প্রভৃতি। বাঙালি গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অনুরাগ তাঁর কবিতায় স্বতোৎসারিত। কন্যাদায়, পুত্রশোক, গৃহবিবাদ, স্নেহস্মৃতি,

বন্ধ্যার খেদ, শিশুর দুরন্তপনা-সরলতা, জননীর বেদনা, কিশোরীর বিস্ময়, বৌ-দিদির স্নেহ, কন্যার অভিমান, গৃহলক্ষ্মীর শান্ত-শ্রী—সমস্ত-কিছুই কবিকে গম্ভীরভাবে স্পর্শ করেছে। অনুপম বাৎসল্য-অঙ্কনেও তাঁর পারদর্শিতা অসামান্য। শিশু-কবিতায় তিনি দেখছেন, 'মন-মুলুকের মালিক দুলাল দল/নন্দদুলালও বিরাজে তোদের মাঝে।'

কালিদাস রায় আমাদের জাতীয় কবি। স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি তাঁর গাঢ় অনুরাগ। মনে হয় বাঙালির জাতীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্য-প্রচারের জন্যই যেন তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত। 'শেষ-কথা' কবিতায় তিনি বলছেন, 'আমি বাঙালির কবি; বাঙালির অন্তরের কথা,/বাঙালির আশা-তৃষ্ণা, স্মৃতি-স্বপ্ন চিরন্তন ব্যথা/ছন্দে গেয়ে যাই আমি।' বাঙালি-সংস্কৃতির ঐতিহ্য তাঁর কাব্যে ভাস্বর। বাংলার উৎসব-আমোদ-প্রমোদ, পূজা-পার্বণ কিছুই বাদ যায়নি তাঁর কবিতায়। বাংলার সংস্কৃতি যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ, তাঁর কল্পনাও সেখানে বাংলার সীমা অতিক্রম করেছে। রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য, ভাগবত-পুরাণ, ভক্তমাল, ভারতের ইতিহাস, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাহিত্য, তামিল, মারাঠা, পারসিক ও আরবীয় সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মানব-মাহাত্ম্যের আদর্শকে অসাধারণ নৈপুণ্যে চিত্রিত করেছেন তাঁর গাথা-কবিতাগুলিতে। দুর্বাসা, ত্রিরত্ন, উমা ও মেনকা, অম্বপালী, রথী ও সারথী—ইত্যাদি তারই দৃষ্টান্ত। মোহিতলালের ভাষায় : 'প্রাচীন সংস্কৃত ও মধ্যযুগের বাংলা—এই দুই কালচারই—একের আর্ট অপরের প্রাণ—আপনার কবিতায় মিতালি করেছে।'

কবির দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতাও কবির কবিতার উপজীব্য। 'বর্ষে-বর্ষে দলে-দলে' যে নতুন ছাত্রদল আসে, তারা শিক্ষকের উষর জীবনভূমিকে সরস ও শ্যামল করে। শিক্ষকতার সহস্র গ্লানি থেকে এখানেই কবির মুক্তি। 'ছাত্রধারা', 'শিক্ষকজীবন'-প্রভৃতি এই জাতীয় কবিতা। অন্যদিকে শিক্ষক ছিলেন বলেই অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান-সমৃদ্ধ নীতিমূলক কবিতা তাঁকে রচনা করতে হয়েছে। তাঁর এ জাতীয় কবিতার সংকলন গ্রন্থ : গাথাঞ্জলি, গাথা-কাহিনী, মনীষী-বন্দনা, তৃণদল-প্রভৃতি মহাকালের ভান্ডারে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

কবিশেখরের লেখনী-প্রসূত হাস্য-ব্যঙ্গ কবিতা এবং অনুসৃতিমূলক প্যারডিও কালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। তারই সংকলন 'রসকদম্ব' ও 'দন্তরুচি-কৌমুদী'। ভাষার ঈষৎ পরিবর্তন করে মূলের ছন্দ ও সুর অক্ষুণ্ণ রেখেও Sublime শব্দ-সমুচ্চয় কীভাবে ridiculous করা যায়—শান্ত-প্রসন্ন রসোপেত রচনাকে কীভাবে কৌতুক-রচনায় পরিবর্তিত করা সম্ভব, তার অসাধারণ নৈপুণ্য কবি দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'বঞ্চিত', 'ঘৃতংপিবেৎ', 'পেটের দায়ে', 'কেরানির রানী', 'লঙ্কামরিচ', 'নস্য'-প্রভৃতি কবিতা।

কালিদাস রায়ের কবিতা ছন্দো-মাধুর্যের সুধাবর্ষণ। ভাব-ছন্দ, অলঙ্কার ও সৌন্দর্যবোধ যেন তাঁর অনায়াস-সাধ্য। ভাষার মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য, মাধুর্য, লালিত্ব, ঝঙ্কার, সরলতা, স্বাভাবিকত্ব ও স্বতঃস্ফূর্ততা; ভাব কোথাও ভাষার ভারে চাপা পড়েনি। তাঁর ভাবের সঙ্গে ভাষা নদীর স্রোতের মতো তালে-তালে নেচে-নেচে, এঁকে-বেঁকে সহজভাবে চলে।

৫.

নিজের কাব্যসিদ্ধি সম্পর্কে কবির মূল্যায়ন : 'গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলাম যাত্রা, কিন্তু তাঁর চলার পথে আগাতে পারিনি। তাঁর পদাঙ্ক-পরম্পরা খুঁজেও পাইনি। জানি না তিনি তাঁর পদাঙ্ক মুছে মুছে চলে গিয়েছিলেন কিনা। তবে তিনি যে বলেছিলেন—এক তারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা। সেই একতারা বাজাতে-বাজাতে এতদূর এগিয়ে এসেছি, যুগ-যাত্রার পথে নয়, জীবনের যাত্রার পথে। যেরূপ দ্রুতগতিতে যুগের পরিবর্তন হয়েছে—তাতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সঞ্জাত কবির পক্ষে সম্ভব নয়। একতারাও এ যুগে অচল।' এই প্রসঙ্গে তাঁর সতীর্থ মোহিতলাল মজুমদারের উক্তি : 'আপনার কবিত্ব—একটি স্থির দীপশিখা, এখনও তার রশ্মি ম্লান হয়নি, হবেও না, সজ্ঞানে গঙ্গালাভের মতো ওই কবিত্ব শেষ পর্যন্ত জেগে থাকবে। তারকব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাবে।'

বাঙালির প্রাণের কবি কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্য-সংকলন দীর্ঘদিন অপ্রাপ্য। বাঙালির স্বভাব-বৈশিষ্ট্যেরই এ অন্যতম প্রমাণ। প্রভূত পাঠান্তরবহুল এই কবির বিপুল কাব্যসম্ভার থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা-নির্বাচনে আমাদেরও অনেক সময় গেছে। প্রসঙ্গক্রমে, এই সংকলন কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কবি কালিদাস রায় আজীবন অক্লান্ত সৃষ্টিশীল এবং অজস্রবর্তী— ; নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে আবার তাঁর মতো অতৃপ্ত-শিল্পীও বিরল। তাই তাঁর প্রতিনিয়ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে আবির্ভূত অজস্র নতুন কবিতার সঙ্গে বারংবার ফিরে ফিরে এসেছে পূর্ববর্তী কবিতাগুলির পরিবর্তিত রূপ। আর, আমাদের সংকলনেরও বিশেষত্ব এই যে, এখানে নির্বাচিত প্রতিটি কবিতা প্রথমে যে গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে স্থান পেলেও, কবির জীবৎকালে প্রকাশিত সেই সমস্ত কবিতার সর্বশেষ পাঠই গৃহীত। এই পরিশ্রম-সাধ্য কাজে কবির 'সন্ধ্যার কুলায়' থেকে অনেক সহায়তা পেয়েছি; তাঁর মনস্বী পুত্রগণ : সর্বশ্রী ভবভূতি রায়, জয়দেব রায়, কবিকঙ্কণ ও কবিরঞ্জন রায় অহর্নিশি সহায়তা করেছেন। এইসঙ্গে অধ্যাপক সুশান্ত বসুর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই কবিশেখরের অগণিত অনুরাগী পাঠকের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

২৫ ডিসেম্বর ২০০১ গোরা সিংহরায়

সূ চি প ত্র

কুন্দ (১৯০৮)

কিশলয় (১৯১১)

পর্ণপুট (প্রথম সংস্করণ : ১৯১৪। পঞ্চম সংস্করণ ১৯৩৪)

বল্লরী (১৯১৫)

ব্রজবেণু (১৯১৫)

ঋতুমঙ্গল (১৯১৬)

পর্ণপুট (২য় খন্ড, ১৯২১)

ক্ষুদকুড়া (১৯২২)

রসকদম্ব (১৯২৩)

লাজাঞ্জলি (১৯২৫)

গাথাঞ্জলি (১৯৬৮)

তৃণদল (১৯৭০)

দিনফুরানোর গান (১৯৮৪)

কাঁটাফুলের গুচ্ছ (১৯৯২)

তথাগত (১৯৯৪)

অগ্রন্থিত-কবিতা

কুন্দ

অতসী-গাঁদা হেম-গরবে মগন সুখ-স্বপনে,
দৈন্য-হিমে,—ফুল না ভুল?—জাগিনু হেথা গোপনে।
তাদের আভা লভিয়া মম
অশ্রু হ'ল ভূষণসম,
সকলে ক্ষম সাহস মম, বরিতে ঋতুরাজারে
পুষ্পময় শুভ্র লাজ আমি এ বন-মাঝারে।

বাণীরে সঁপি বরণ মম লভিনু যাহা তুষারে,
অলিরে সঁপি মাধুরীটুকু পরাগ সঁপি উষারে।
ফুটায়ে প্রিয়া-দন্ত-রুচি
কবিরে সঁপি হর্ষ শুচি,
রবিরে সঁপি নীহারটুকু সুরভি করি পরশে।
পল্লী-রমা-কেশে বরিব মরণ শেষে হরষে।

ফুটেছি আমি, রুচি কুঁড়িতে হয়নি মোরে ঝরিতে,
তুচ্ছ হোক—সবি তো মোর পেয়েছি দান করিতে।
এ সুখময় সার্থকতা
গর্বে স্মরি! কিসের ব্যথা?
আদর-প্রীতি উপরি পাওয়া না মেলে যদি কি ক্ষতি?
ফোটার সুখে বেদনা-তৃষা লভেছে সবি তৃপতি॥

আগমনী

(শরতের)

আজি—নবনীহৃদয়া এসো মা অভয়া মণিমঞ্জুষা করে,
প্রাণে—হরষ বরষি সরস করিয়া বঙ্গে বরষ পরে।

এসো—শারদগগন মগন করিয়া শুচি জোছনার বানে,
গিরি—বন প্রান্তরে হরিত অরুণ ঘনতরুণিমা দানে।
এসো—প্রকটিয়া তারাপুঞ্জ,　গুঞ্জনে ভরি পুঞ্জ
কল—কূজনে মুখরি নমেরু-কুলায় রঞ্জিয়া জলধরে।

এসো—পয়স্বিনীব আপীন ভরিয়া অমৃত গোবস রসে,
দীন—নিঃস্বের গৃহ শস্যে ভরিয়া, বিশ্ব উজলি যশে।
এসো,—পুষ্প ভরিয়া গন্ধে　মঞ্জুতা—মকরন্দে।
এসো—হ্রদ সবোবর ভরি কোকনদে কুমুদে ইন্দীবরে।

এসো—নদনদী ভরি মীন-বৈভবে কান্তার ভরি কাশে,
তরু—বল্লরী ভরি ফল-গৌরবে তড়াগ ভরিযা হাঁসে।
ভরি—শালিসম্পদে ক্ষেত্র　করুণায় ভরি নেত্র
এসো—ঝঙ্কৃত করি গিরিকন্দর নির্ঝর ঝরঝরে।

এসো—শিশুর আস্য হাস্যে উজলি লাস্যে আঙিনা ভরি
নব—স্বাস্থ্যে ভরিয়া শীর্ণ অঙ্গ, জীর্ণ জড়তা হরি।
কর—বিতরি স্তন্য অন্ন,　সন্তানগণে ধন্য
এসো—বিশ্বম্ভরা সন্তাপহরা—বঙ্গের ঘরে ঘরে॥

গৃহলক্ষ্মী

ভূষণহীনা মলিনদীনা এসো আমার প্রিয়া,
সজ্জা নাহি, লজ্জা কিসের? কাতর কেন হিয়া?
গন্ধতেলে খোঁপার বাহার　লালসা-লোভ নেইকো তাহার,
অম্‌নি বেশে সাম্‌নে এসে দাঁড়াও রমণীয়া,
আল্‌তা আঁকা, সাবান মাখা নাইবা হল, প্রিয়া।

গয়না পরা সয় না আমার, আসতে হবে খুলি।
চাই না আমি তৈরি করা ময়নাপড়া বুলি,
সত্যকথা সরল কথা　শুনতে প্রাণের ব্যাকুলতা।
হবে না ও কুসুমতনুর মুছতে পরাগগুলি।
গয়না যদি থাকেই গায়ে, আসতে হবে খুলি।

সাজ করা আজ সইব না সই শোভন দেহময়,
পদ্মাবতীর সজ্জা নটীর সহ্য নাহি হয়।

রঙ মাখালে শেফালিকার শ্রীগরিমা বাড়াবে কি আর?
শ্যামের ভোগে আমিষ পরশ কোন পূজারির সয়?
কোন দুখে বা গোপন কর আপন পরিচয়?

রান্নাঘরের হলুদমাখা ময়লা তেলে-জলে,
আটপহুরে শাড়ির আঁচল থাকুক তোমার গলে।
নখ গেছে ক্ষয় বাটনা বেটে, কুট্‌না কুটে আঙুল কেটে,
চুন-খয়েরে দাগ পড়েছে তোমার করতলে।
জাহ্নবী তো হবেই মলিন আষাঢ় মাসের ঢলে।

তুল্‌সীতলার মণ্ডলীতে শ্রীমণ্ডপের মাঝে,
হাত দু-খানি রুক্ষ হল মাজাঘষার কাজে।
তন্বি, তোমার বদননলিন বহ্নিতাপে স্বিন্ন-মলিন,
যজ্ঞ হতে উঠলে যেন যাজ্ঞসেনীর সাজে।
গৌরবে সই সামনে এস, লুকাও কেন লাজে।

'সতী'র অলক লৌহ হয়ে বেড়িল ওই হাতে,
বাগ্‌দেবীরে স্মরায় শাঁখা শুভ্র সুষমাতে।
আঁধার চিরে অরুণলেখা তোমার শিরে সিঁথির রেখা,
অরুন্ধতীর রাঙা পায়ের অরুণ দ্যুতি তাতে,
জ্বালায় নিতি সন্ধ্যারতি কুটির-আঙিনাতে।

ধূপ তো আছে, নেইবা হল রুপার ধূপাধার?
সৌধহারা বৌধ-গয়ার মহিমা অপার।
পল্লীবনের চীনকরবী মধুময়ী পীত সুরভি,
সোনার চাঁপায় কি হবে, নাই গন্ধমধু যার?
কুণ্ঠা কিসের, কণ্ঠে যদি নাইবা থাকে হার?

শাশ্বত সত্য

তোমার সত্য-ভাণ্ডার দেব, খুলে দাও, খুলে দাও,
ভবের ভীষণ তমসার পানে জ্যোতির্নয়নে চাও।
আঁধারে সবাই বৃথা খুঁজে মরে,
যাহা পায় তাই বুকে চেপে ধরে,
সত্য পেয়েছি বলিয়া গর্বে হাঁকিতেছে "নাও নাও",
সত্য-আলোকে তাদের ভ্রান্তি-ধ্বান্ত ঘুচায়ে দাও।

তোমার সত্য সোমের জ্যোতিতে ব্যোম পথে শোভা পাক,
ভ্রান্তির পথে অবোধ পান্থ থমকি দাঁড়ায়ে চাক।
শ্রুতি, দর্শন, স্মৃতি, বিজ্ঞান,
বেদ, বাইবেল, পিটক, কোরাণ,
এদের বিশ্বজয়-অভিমান স্তম্ভিত হয়ে যাক,
জগতের যত গর্বিত গুরু নতশির হয়ে থাক।

তোমার সত্য-স্বরূপের দীপ একবার ধরো তুলে,
দেখাও,—অতীত, জঞ্জাল শুধু জ্ঞানসিন্ধুর কূলে।
জগতের এই কোলাহল মেলা
হয়ে যাক সব বালকের খেলা,
শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতালোক, সব মিশে যাক ভুলে,
তোমার সত্য শাশ্বত-দীপ, ধরো তুমি ধরো তুলে।

তুলসী

শুনি হরিগুণ-গান নারদের বীণাতান
কোন ভাণ্ডীর-বনে উলসি,
ভক্তের প্রাঙ্গণে এলে তুমি শুভখনে
পূত পুলকাঞ্চনে, তুলসী।
যথা নাহি অহরহ অর্চনা-সমারোহ,
রাশি-রাশি ভোগ্যের বিপণি,
নাহি ঢাক ঢোলে ঘটা নাহি ধূপ-দীপ-ছটা
বলি-হোম-সোমে সন্দীপনী।
তুমি যেথা আছ সতি নিঃস্বের সঙ্গতি
ভক্তের শ্যামলিত আকুতি,
একাধারে বেদিকার নব-ষোড়শোপচার
পাণিপল্লবে দীন কাকুতি।

নাহি ফুলগৌরব নাহি ফলবৈভব
নাহি সৌরভ-রেণু-ঘনতা,
আসেনাকো ষটপদ তাই বুঝি হরিপদ—
কমলের ভৃঙ্গের জনতা।
ভক্তের অঙ্গনে রচ তুমি তপোবনে
নব মায়া-কাশী-গয়া-দ্বারকা।

মঞ্জরী-শলাকায় ফুটাইছ যুগে-যুগে
মূঢ় অন্ধের আঁখি-তারকা।
বৈশাখী আঁখিজল ওই শাখে অবিরল
ঝরে মূলে, জ্বলে মৃৎদীপালি।

কাঙালের ভিটেখানি জুড়ি পল্লব-পাণি
পূজে তোমা দিয়ে চাঁপা-শেফালি।
বিশ্বের বন থেকে শবসাধকেরে ডেকে
বামাচার-পাপ তার মোচিলে।
কেন্দুবিল্ববনী জিনি তুমি নারায়ণী
কান্ত পদের খনি রচিলে।
রাজভোগে বীতরাগ দীনজন-বন্ধুরে
প্রেমমঞ্জরী-দানে তুষিলে।
বিশ্বেশ্বরে তুমি নিঃস্বের গৃহে পেয়ে
ব্রজরাখালের বেশে ভূষিলে।

সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিবেদন-আবেদন
করে গৃহী অরপণ চরণে,
সর্ব বিচারভার অর্পিয়া তোমা তার
ভুলিল সে ধর্মাধিকরণে।
বিদুরের ক্ষুদকুঁড়া বহ তুমি হে মধুরা
শ্রীআননে, অচ্যুত-দূতিকা,
হয়ে তব সহচরী হল সেবা-অধিকারী
কুন্দ-মালতী-বেলা-যূথিকা।
গোরাগুণ-কুতূহলী, কীর্তন-পথ-ধূলি
অঞ্চলে তুলি-তুলি রাখিলে।
ভবরোগে সম্বল, সব রোগে মঙ্গল
অনাময় লভি তাই মাখিলে।
তুমি যারে ডাক সতি দাও তারে পরাগতি
হরি-প্রেমে 'গজপতি' ভাসে যে।
ত্যজি সুখসম্পদ গুরুপদ-রাজপদ
দীন বেশে তব বনে আসে যে।
যুগে-যুগে নদীয়ার, খেতুরী ও সাতগাঁর,
গৌড়ের যত মধু-তৃষিত,
কমলা-কমল-বন ত্যজি তব বনে এসে
বিরচিল মৌচাকে অমৃত।

বৃন্দা, তোমার বনে   বৃন্দাবনের লীলা
আজো বুঝি চলে রসনটনে,
তুমি সতী জাদুকরী,   ভক্তের মাধুকরী-
ঝুলি ভরো সন্তোষ-রতনে।
শ্রীবাসের অঙ্গনে   ত্রিবেণীর সঙ্গমে
নেয়েছিলে যেই রস-ঝারাতে,
বাঞ্ছাকল্পতরু,   আজো সংসার-মরু
সরস রেখেছ সেই ধারাতে।
দারু-মালিকার ছলে   কঙ্কাল-শৃঙ্খলে
ভক্ত শ্রীকণ্ঠের শাসনে,
করিয়াছ বঞ্চিত   সংযম-কুণ্ঠিত
হরিনাম বিনা বৃথা ভাষণে।
হরিপাদ-সম্ভবা   তরুরূপা জাহ্নবী
তুমি দেবি বৈষ্ণব-ভবনে,
মহাযাত্রীর শিরে   ছায়াখানি সঞ্চারি
হরিনাম দাও তার শ্রবণে।

অনুতাপ ও অশ্রু

যবে অনুতাপ সব গ্লানি পাপ করিল ভস্মচূর্ণ,
অশ্রু-গঙ্গা ভাসাইল তায় দূরদূরান্তে তূর্ণ।
অনুতাপ যবে হল-কর্ষণে কোমল করিল চিত্তে,
অশ্রু ভূষিল খর-বর্ষণে শস্য-শ্যামল বিত্তে।

অনুতাপ যবে পাপেরে জিনিয়া ফিরিল শিবির-কক্ষে,
অশ্রুহীবক-বিজয়-মাল্য দুলিল তাহার বক্ষে।
নারায়ণ যবে অনুতাপরূপে অবতরিলেন মর্ত্যে,
লক্ষ্মী তখন অশ্রুধারায় মিলিলেন আঁখি-বর্ত্মে।

মরণ-গৌরব

তপনের মতো মোর সগৌরব মরণের লোভ,
ব্যোমলোক উজলিয়া সন্ধ্যারাগে হাসিতে হাসিতে,
এ ধরার পরমায়ু হোক ক্ষীণ—তাহে নাই ক্ষোভ,
হোক বিড়ম্বনা-ভোগ, দিন-দিন যাইতে-আসিতে।

চাহিনা মরণ আমি, মহাকাল, চন্দ্রমার মতো,
পক্ষ ধরি বক্ষে ধরি তিল-তিল ক্ষয়ের যন্ত্রণা,
কি হবে জীবন-দীর্ঘ যদি তাহা মেঘশয্যাগত?
চাহিনাকো চারিপাশে সারারাত তারার বন্দনা।

তপ ও জ্ঞান

মিলে হাসি-মুখ শত জনমের কত তপ-উপচয়ে,
মূঢ় সেইজন রূঢ় তপ যেবা করে তার বিনিময়ে।
সরল হৃদয় অগাধ জ্ঞানেরই পরম-চরম দান,
পাপী সে করে যে তার বিনিময়ে জটিলতা-সন্ধান।

পলিত ও ললিত

"একে একে ক্রমে করেছে প্রয়াণ সকল সাথী।
শীতের শীতল সমীর কাঁপায় দিবস-রাতি।
এখনো জীর্ণ পলিত শীর্ণ পর্ণ ওরে,
তরুণ শাখায় রোস্ কি আশায় শুধাই তোরে?"
"যে গেছে সে যাক আমার এখনো আসেনি দিন,
বাকি আছে মোর শোধিতে এখনো ধরার ঋণ।

কচি কিশলয়ে আঙুলি রহিব দারুণ মাঘে,
ছায়াটুকু দিব শিশিরে বাঁচাবো ঝরার আগে।"

চারিটি উপমা

হাসিহীন মুখ যেন শশিহীন স-ঘন গগন,
গানহীন কণ্ঠ যেন মূক-ম্লান কারার জীবন।
অশ্রুহীন দৃষ্টি যেন বৃষ্টিহীন ধূসর নিদাঘ,
দীর্ঘশ্বাসশূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ।

ভক্তি ও ঘৃণা

ঊর্ধ্বে ছুটে উৎস-সম ভক্তি, হৃদি ভেদিয়া,
স্বরগ-দিকে টানিতে চাহে হৃদয়ে।
ঘৃণা সে নামে প্রপাত-সম মরমদ্বার ভাঙিয়া,
হৃদয় নিচে আনিতে চাহে নিরয়ে।

ভক্তি সে যে শরমফুলে আলোকে তুলে ফুটায়ে
পুলক-ভরে গন্ধ-মধু বিতরি।
ঘৃণা তাহারে সংকোচেতে মুদিয়ে আনে গুটায়ে
অন্ধকারে কৃষ্ণদলে আবরি।

অপ্রবুদ্ধ উপভোগ

পড়েন গোঁসাই খুড়ো গদগদ ভাষা,
সুর করি ভক্তিভারে ভাগবত-শ্লোক।
মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রয় ভক্তি-প্রাণ চাষা,
পাঠমাত্র শুনি জলে ভরে গেল চোখ।
ফিরিয়া তাহার দিকে কহেন গোঁসাই,
"অর্থ না করিতে তুই, কি বুঝিলি বল?"
চাষা কয়—"হে ঠাকুর, কিছু বুঝিনাই।
জানি না তবুও পোড়া চোখে কেন জল।"

দুর্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক আজি আনমনে ভুলেছ নিত্যযাগ,
কোথা ঋত্বিক করনি সাধন বিহিত কর্মভাগ।
কোথায় শিষ্য ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্বাসা আসে দুর্বার বেগে, অবহিত হও সবে।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ পরানে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয় না চেতনা তায়,
তরুলতাগুলি পায়নি পানীয়, হরিণী শষ্পদল,
দুর্বাসা আসে দুর্ভাষা মুখে, কোথায় পাদ্যজল?

কোথা নরপতি লালসা-লালিত, পুষ্পবাটিকামাঝে
বিলাস-ব্যসনে আছ সারাবেলা হেলা করি রাজকাজে?
কোথা শূরবর, ভুলেছ সমর প্রেয়সীর কর ধরি?
দুর্বাসা আসে,—দুর্বলচেতা, জাগো মোহ পরিহরি।

ভুলি দেব-দ্বিজপূজা, ব্রত, নিজ জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরীলীলায় বিলসিছ নিশিদিন!
ভোগ-লালসার মোহে কে ভুলেছ গৃহলক্ষ্মীর ব্রত।
দুর্বাসা আসে, নিজ সাধনায় হও সবে তদ্‌গত।

আসিছে মূর্ত রুদ্রশাসন, ভ্রূকুটিকুটিল মুখ,
শিরে জটাবন, নয়নে দহন, শ্মশ্রুগহন বুক।
সাধনার ভার বহ আপনার, মোহের আঁধার নাশি,
জাগ্রত রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি।

মথুরার দূত

বিদায় চন্দ্রাননে,
এসেছে আজিকে মথুরায় দূত আমার বৃন্দাবনে।
সাঙ্গ আজিকে বাঁশিরব-গান,
হল ব্রজে কলহাসি অবসান।
শেষ অভিসার, মান-অভিমান, উচ্ছল রসাবেগ।
যদিও যমুনা ভরা টলমল,
নীপনিকুঞ্জ পুলকোচ্ছল
ময়ূর-ময়ূরী নৃত্যচপল, গুরু-গুরু ডাকে মেঘ,
তবু হায় যেতে হবে,
বারতা বহিয়া মথুরার দূত গোকুলে এসেছে যবে।

বোলো সখাসখীগণে—
এসেছে নিঠুর মথুরার দূত বঁধুর কুঞ্জবনে।
জলকেলি শেষ ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে,
কালীদহে তটবিটপী কাঁপায়ে,
বৃথা বনফলে ভরিছ আঁচল, মিছে গাঁথ মালা আর।
ফুলের ঝুলনা লুটিবে ভূতলে,
ভাবিতে নয়নে সলিল উথলে।
যাই বুকে বহি রসরাস-দোল-ঝুলনের স্মৃতিভরা।
মিছে আর মায়াডোর,
ভেসে যাক চলে যমুনার জলে সাধের বাঁশরি মোর।

বোলো অভাগিনী মায়,
আজিকে তাহার প্রাণের দুলাল বাঁধন কাটিয়া যায়।
কে হরিবে আর ক্ষীর-সর-ননী?
কে ধরিবে শিখিপুচ্ছ-পাঁচনি?
শত আঁচলের গ্রন্থি টুটাতে হিয়া ফেটে শতখান।
বোলো গোপীগণে,—যমুনার ঘাটে,
সাঁঝে নদীতটে, দিনে দধিহাটে,
আজ হতে হল যত লাজ-জ্বালা-যাতনার অবসান।
মিছে ডাকো বারে-বারে,
এসেছে আজিকে মথুরার দূত কানুর হৃদয়দ্বারে।

কেমনে হেথায় রহি?
মথুরার দূত এসেছে নিদয় বিদায়নিদেশ বহি।

ডাকিছে সত্য বিষাণ-বাদনে
জীবন-মরণ-রণ-প্রাঙ্গণে,
ডাকে মথুরার কাতর কাকুতি, আতুরের আঁখিলোর।
পাষাণ-কারার আকুল রোদন
করেছে সুপ্ত তেজের বোধন,
ভাঙিতে হয়েছে রাগের স্বপন, ফাগের রঙিন ঘোর।
মিছে আর আঁখিজল
মথুরার দূত করিয়া দিয়াছে অন্তর চঞ্চল।

বৃন্দাবন অন্ধকার

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার!
চলে না চল-মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠসুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ছোঁয় না তৃণ গোঠের ধেনু, ব্রজের বনে বাজে না বেণু,
করে না শ্যামরাধিকা লয়ে শারিকাশুক দ্বন্দ্ব আর।
পিয়ালফুলপরাগ মাখি আয়ত-তরলায়িত আঁখি,
হরিণী আজি লেহন করে চরণসুধাস্যন্দ কার?
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

শিখীরা আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা,
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার।
রুচে না কারো নবনীসর, হেলায় লুটে অবনী 'পর,
করে না দধিমন্থ বধূ নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ফেনিল কেলি সলিলে নাহি তটিনী আর ছুটে না গাহি,
পাটনী কাঁদি তরণী বাঁধি করেছে খেয়াবন্ধ তার।
নূপুর-হার হারানো ছলে গোপীরা সাঁঝে যমুনাজলে
করে না দেরি আজিকে হেরি হাসিটি শ্যামচন্দ্রমার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ঝলসি দহে বেতসীবন হুতাশে ঝুরে হতাশ মন,
রচে না কোলে ঝুলনদোলে মিলন-প্রেমানন্দ-হার,

সখারা শোক-বিবশ বেশে মুরছি পড়ে দিবসশেষে,
গাঁথে না মালা, ভরিয়া ডালা তুলে না ফুল বন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

গোপললনা নায়কহীনা শোকশায়কে শায়িতা দীনা,
নয়ননীরে বাড়ায় ব্যথাপাথার ভানুনন্দনার।
চিৎকুমুদী ঢুলিছে মুদি থেমেছে গীত কণ্ঠ রুধি,
গোকুল মৃৎপিণ্ড হল চলে না হৃৎস্পন্দ আর।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

পাদমেকং ন গচ্ছামি

ব্রজের সখী, ব্রজের সখা, কাঁদছ কেন করুণ রোলে?
আমার সাধের গোকুল ছেড়ে কোথাও আমি যাইনি চলে।
রজের মাঝে পেয়ে আমায় শিহরে ওই ব্রজের দেহ,
প্রতি হৃদয়স্পন্দে আছি, কেঁদ না আর তোমরা কেহ।
ব্রজের বাটে, ব্রজের ঘাটে, ব্রজের গোঠে, মাঠের মাঝে,
শষ্পলতায় পুষ্পপাতায় আছি হেথায় নানান সাজে।
কাঁদছ মিছে, নয়ন মুছে দেখ চেয়ে এই-যে আমি।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।
বরন আমার বিলীন হল ব্রজের শ্যামল-দূর্বাদলে,
শাঙন গগন মগন করি কালিন্দীর ওই কালো জলে।
ময়ূর-নাচা তমালবনে সংশয়ে চাও মাঝে-মাঝে,
ভুল তাতো নয়, আমার চাঁচর-চিকুর-চূড়া সেথাই রাজে।
গোপাঙ্গনার অঙ্গতটে উল্লাসিতে উচ্ছলিয়া
গলে গলে নামলো গিয়ে কালিন্দীতেই আমার হিয়া।
রসাল-শাখার শুক-শারিকা করছে আজো আমার নাম-ই,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।
বেণুর বনে বাজলে বাঁশি চমকে ওঠ,—চেন না কি?
কালীদহের নীলোৎপলেও দেখনি কি আমার আঁখি?
কৃষ্ণসারের চরণ-পাতে থমকে দাঁড়াও চাও যে পিছে,
আমার চরণশব্দ সে তো,—একবারে তা নয়কো মিছে।
বন্ধুজীবে রক্ত-অধর,—কিশলয়ে নখর-রুচি,
পদ্মদলে চরণ দুলে,—কুন্দফুলে হাস্য শুচি,
চিনি-চিনি চিনতে নারো, চমকে উঠে চাও যে থামি!
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

পাটল অশোক-পলাশবনে ফাল্গুনে মোর রঙের খেলা,
পরাগ রাগের হোলির ফাগে উচিত আমায় চিনে ফেলা।
বকুলডালে বেতস-বনে বাদল বায়ে ঝুলন করি,
ব্যাকুল চোখে চেয়েও থাকো, যেন আমায় ফেলে ধরি।
দেখছ না ওই চলছে আমার রাসের লীলা চুপে-চুপে,
হাজার ঢেউয়ে পৌর্ণমাসীর পূর্ণ শশীর হাজার রূপে।
উদাস বায়ুর পরশ দিয়ে বিবশ করি দিবসযামী,
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।

কৃষাণীর ব্যথা

সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায় সংসার আঁধারিয়া?
ধানে-ধানে আজ উঠান ভরেছে, ঠাঁইটুকু নাই আর,
মঙ্গলা আজি ঢালিতেছে দুধ বাছুর হয়েছে তার।
মাচান ছাপিয়ে লাউলতাগুলি ভুঁয়ে লুটে-লুটে পড়ে
পালঙের শিষে শাকের চাকড়া আগাগোড়া আজ ভরে।
সন্ধ্যামণিতে আলো হয়ে আছে সারা আঙিনাটি ওই,
আজ সংসারে সবি ভরপুর, হেন দিনে তুমি কই?

দু-বেলা পাওনি পেট ভরে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেগে।
একমুঠো চাল চিবাতে-চিবাতে রুইতে গিয়েছ চলি,
উপোষ করিয়া রাত কাটায়েছ ক্ষুধা নাই মোরে বলি।
দুপুরের তাতে বাদলের ছাটে খেটে-খেটে দিনরাত,
মাঠে-মাঠে ঘুরে কনকনে জাড়ে করেছ পরানপাত।
সাঁঝের বেলায় হেঁটে-হেঁটে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে,
রাত্রি কাবার না হতে আবার চলেছ খোকারে চুমে।

বাকি খাজনার লাগি জমিদার দিয়েছে যাতনা কত,
মহাজন, দেনা সুদের জন্য গঞ্জনা দেছে শত।
চুপ করে সবি সয়েছ, আহা রে! দুটি-হাত জোড় করে
সকলের কাছে সময় নিয়েছ হাতে-পায়ে ধরে-পড়ে।
রোগে পড়ে থেকে সংসার নিয়ে কতই দিয়াছি জ্বালা,
ক্ষুধায় কাঁদিয়ে করেছে ছেলেরা কান-দুটো ঝালাপালা।

যাতনা-দুঃখ কতনা সয়েছ কথাটি ছিল না মুখে
ফিরে এস আজ ঘরটি তোমার ভরিবে সোনার সুখে।

ঘনায়ে আসিছে সাঁঝের আঁধার নাহি মোর কোন কাজ
এ ঘর-দুয়ারে পড়েনিকো ঝাঁট জ্বলেনি এখনো সাঁজ।
চালের বাতায় ঝিঁ-ঝিঁ পোকাগুলো বুক চিরে-চিরে ডাকে,
উঠিতে-বসিতে টিক্‌টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে।
ওইখানে আহা পিঁড়ের উপর শুইতে গামছা পাতি,
ঝুলিতেছে ওই লাঠি, চোঙ, মই, মাথালী, তালের ছাতি।
ঘাটের ধারের বাঁশবন-পানে সারারাত চেয়ে কাঁদি,
ওইখান হতে নিঠুর বাঁধনে লয়ে গেছে তোমা বাঁধি।

তেমনি পড়েগো কালো ছায়া ওই ভরিয়া বকুল-তল,
বৈকালে যেথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল!
সাঁজে-ভোরে সেই পাখিগুলো ডাকে প্রাণ আনচান করে,
বেলা হয় তবু গোরুগুলো সব বাঁধা রয়ে যায় ঘরে।
পথ চেয়ে হায় বসে থাকি ঠায়, জ্বলে না দুপুরে চুলো।
আপন ছেলেরো নাম ভুলে যাই মনটা হয়েছে ভুলো।
মালতী তোমার এসেছে ফিরিয়া শ্বশুরের ঘর থেকে,
খোকা যে তোমার হাঁটিতে শিখেছে ; একবার যাও দেখে।

এত সব ফেলি জনমের মতো চলে যাওয়া কিগো সাজে?
তবে কিগো তুমি 'প্রবাস' গিয়েছ আমাদেরি কোন কাজে?
বাবুদের আর গদাই পালের অত্যাচারের ভয়ে,
চলে গেলে কিগো মনের দুঃখে কিছুই না বলে কয়ে?
তাই যদি হয় ফিরে এসো তুমি তোমারে সঙ্গে-পেলে,
খোকারে লইয়া পালাই কোথাও ঘর-সংসার ফেলে,
ভিক্ষা মাগিব, কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ি,
আঁচলের গিঁঠে বাঁধিয়া রাখিব তিলেক দিব না ছাড়ি।

ভূতো-বাড়ি

ওরে জীর্ণ পল্লীসৌধ, অঙ্গে তোর ধরেছে ফাটল,
কড়িগুলি পড়্-পড়, নাই কোন দুয়ারে আগল,
বুজে গেছে পাতকুয়া—ঘরে-ঘরে জমাট জঞ্জাল,
খসে গিয়ে চুণবালি প্রকটিত ইটের কঙ্কাল।

লূতাতন্তু-যবনিকা বাতায়নে করিছে বিরাজ,
অহি-নকুলের তুই সংগ্রামের রঙ্গভূমি আজ।
মেলেছে অশ্বত্থবট মূলজাল বলভির 'পরে,
শিয়াল-কাঁটার বনে শিয়ালেরা ঐক্যতান ধরে।
দীর্ণবক্ষ শীর্ণদেহ কতো বর্ষা-ঝঞ্ঝাঘাত সহি,
এখনো দাঁড়ায়ে তুই উৎসবের শত-স্মৃতি বহি।
গাত্রে বসুধারা দাগে, দেহলীতে সিন্দুর চন্দনে,
মঙ্গলবাসরগুলি চিহ্ন রেখে গিয়াছে জীবনে।
কক্ষে-কক্ষে বক্ষে তোর কত হাস্যপ্রমোদের মেলা,
কত শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, শিশুদের কত নৃত্য-খেলা,
ধূপদীপে অধিবাস, নান্দীমুখ, বাসরশয়ন,
কুট্টিমে-কুট্টিমে কত তরুণীর নূপুর-নিক্কণ,
আজি সবি স্মৃতিসার বৃথা আর কার তরে শোক?
যারা হেথা সুখে ছিল তারা আজ নগরের লোক।
উড়ে গেছে পারাবত, চামচিকা করিছে চিৎকার,
চলিয়া গিয়াছে লক্ষ্মী রেখে গেছে পেচকেরে তার।
জীবন্ত মানুষগুলো গেছে তোরে অনাথ করিয়া,
মৃতেরা ফিরেছে বুঝি প্রেতরূপে, মমতা স্মরিয়া।

অলির প্রতি কুসুম

এসো কালো বঁধু মম গাহি গান, প্রিয়তম,
নিশিদিন ডাকি যে তোমায়,
ফুল-জীবনের সার তারুণ্য, লাবণ্য-ভার
সুকুমার এ কৌমার সঁপিতে ও পায়।
রূপ আছে আছে রস, রয়েছে গন্ধের যশ,
আছে স্পর্শ শীতল-মধুর,
নাই সুর নাই গান, ম্লানমৌনী মূক-প্রাণ,
রেণুঘন শ্বাসে তাই ব্যথায় আতুর।
পাখার পরশ দিয়া দাও তনু কণ্টকিয়া
কেশর-রোমাঞ্চে কর এ হৃদি চঞ্চল,
গাহি গুন-গুন গান অবশ এ মূক-প্রাণ
কর প্রেমানন্দরসে রভস-বিভল।

তুমি বিনা সবই ছার যৌবন হয়েছে ভার
লালিত্য লুলিত তার ওগো কালোবঁধু,
সৌরভ পীড়িয়া প্রাণে রৌরব-যাতনা আনে,
কালকূট হয়ে দহে মরমের মধু।
কাব্যের বৈভব বহি আর কতকাল রহি
কবি বিনা সবি যে বৃথায়।
সংগীতের উপাদান অঝঙ্কৃত ম্রিয়মাণ,
দাও সুর, দাও প্রাণ তায়।
নীরব এ নাট্য-শালা, বৃথা তায় দীপ জ্বালা,
গান বিনা অলস-স্বপন,
এত ঋদ্ধ আয়োজন বিনা হৃদ্য প্রিয়জন
তারাহারা যেন দুটি অরুণ নয়ন।
কালার বাঁশরি বিনা পিয়ারী মলিনা-দীনা
ফুলের দোলনা তার ধুলায় লুটায়,
কালো জলদের বাণী না মাতালে হৃদিখানি
কলাপী রূপের ছটা বিলাপে গুটায়।
কালো কোকিলের গীতি বিনা, কুহেলির স্মৃতি
কে ঘুচাবে কাননের মর্মের-মর্মরে?
বিনা দুটি কালো আঁখি, শুধু লোধ্ররেণু মাখি
আরক্ত কপোল কভু বঁধু-মন হরে?
কালো দিঘিটির বারি জ্বালাতাপ-দাহহারী,
কালো ছাড়া উপায় কোথায়?
কুসুম-কৌমার-চোর, এসো কালো বঁধু মোর
আপনারে সঁপি তব পায়।

মন্দিরে না সিন্ধুনীরে

মন্দিরে কি সিন্ধুনীরে কোথায় আছ, জগন্নাথ?
পবিত্র এ ক্ষেত্রে তোমায় কোথায় করি প্রণিপাত?
দেখলে ভেবে রয় না দ্বিধার ধুক্‌ধুকুনি বুকটিতে।
বন্ধমাঝে তেম্‌নি আছ—যেম্‌নি আছ মুক্তিতে।
হেরি হেথায় সকল ঠাঁয়েই কি তারকা, কি গ্রহে,
অনন্তনীল বিস্তারণে, দেবালয়ের বিগ্রহে।
অসীম হতে সসীম পথে নিত্য তোমার যাতায়াত,
সিন্ধুতীরে—শ্রীমন্দিরে তোমায় নমি জগন্নাথ।

শিল্প-শোভায় তেম্‌নি আছ যেমন আছ নিসর্গে,
আছ মানব-সংসারে এই যেমন বিরাগ-বিসর্গে।
রণোন্মাদে তেম্‌নি আছ, যেমন আছ শান্তিতে ;
রুদ্রে আছ, ভদ্রে আছ, উত্তালতায়—ক্ষান্তিতে।
সৃষ্টি পালন-লয়ের মাঝে সমান তোমার অধিষ্ঠান,
চক্রগদায় ধ্বংস করো, পাঞ্চজন্যে অভয়দান।
অন্ন দিয়ে পালন করো, বন্যা দিয়ে সমুৎখাত।
স্তব্ধ তুমি, ক্ষুব্ধ তুমি—তোমায় নমি জগন্নাথ।

শান্ত-সাকার, তুমিই আবার অপ্রশান্ত-নিরাকার,
বাঙ্‌মানসাতীত হয়েও 'যোগক্ষেমে'র বইছ ভার।
উপচারের স্তূপের ভারে লুপ্ত তোমার পদদ্বয়,
প্রচণ্ড তাণ্ডবে আবার ঠেল্‌ছ পায়ে অর্ঘ্যচয়।
শ্রীমন্দিরে তোমার পাতা মধুপুরীর সিংহাসন,
উদ্বেল উদ্দণ্ডলীলায় সিন্ধু তোমার বৃন্দাবন।
মানব তোমায় চামর ঢুলায়, দানব দুলায় ঝঞ্ঝাবাত,
দারুব্রহ্ম—বারি-ব্রহ্ম—তোমায় নমি জগন্নাথ॥

পালামৌ

ওই যে গিরির গায় শোভিছে গিরি
তমালপিয়াল ছায় রয়েছে ঘিরি,
নীলাকাশে দিক্‌ শেষে ধূমাইয়া ঠিক মেশে,
দ্যুলোক-দেশের পথে সাজানো সিঁড়ি।

স্বপনপুরীটি বুঝি মায়ায় গড়া,
পালঙ্ক-দুলানো হুরী-পরীতে ভরা।
কাছে ভাবি যাও যত, আরো দূর, দূর কত?
নীল মরীচিকা যেন বুদ্ধিহরা।

যেখানে আঙুল দিয়ে বালুকা খুঁড়ে
জলপান করে রাহী আঁজুল পূরে।
যে নদী শুকানো-মরা, দেখিবে দু-কূলভরা
পার হয়ে কিছু পরে আসিতে ঘুরে।

পাষাণ চিরিয়া যেথা ফোয়ারা ঝরে,
কোলবালা সাঁজবেলা সিনান করে।
কোমরে দু-হাত দিয়ে নারী চলে জল নিয়ে,
তিনটি গাগরি রেখে মাথার 'পরে।

কালো পাথরের ছবি নিখুঁত হেন
কিশোরী চলেছে ছুটে যমুনা যেন।
কে বলিবে ঝোপে-ঝাড়ে উজান বহাতে তারে
বাঁশরিটি বারে-বারে বাজিছে কেন?

আপনার বাহুবল, প্রাণের প্রভু,
তরুণী এ দুটি সার, ভুলে না কভু ;
পতিরে বিঁধিতে এলে বুকে তীর ধরে ফেলে ;
প্রেম সে মাতাল বটে, অটল তবু।

বকুলের বালা পরে বালক-বালা,
গলে শোভে লাল-নীল স্ফটিকমালা।
পাখির পালক চুলে, পুঁতির নোলক দুলে,
মহুয়ার ছায়াতলে নাট্যশালা।

মহুয়ার মদে চোখ ঘোরালো ভারি,
জোরালো-জোয়ান কোল ধনুকধারী,
ভালুকে ধরিয়া কানে গুহা থেকে টেনে আনে,
বালক ঝাঁপায়ে পড়ে পৃষ্ঠে তারি।

চকিত চটুল মৃগ আয়ত-আঁখি
ছুটেছে পিয়ালরেণু গায়েতে মাখি।
রঙিন-স্বপন-আঁকা শিখীরা ছড়ায় পাখা,
একসাথে ধরে তান হাজার পাখি।

মহুয়ার ফুলে সুরা চুঁয়ায়ে পড়ে,
মাদলে শিরীষ ফুল-বাদল ঝরে।
দাঁড়ালে বকুল-মূলে পা দু-খানি ডুবে ফুলে,
রূপ-অভিমানে নীপ শিহরি মরে।

নদীতটে জোছনার ফিনিক ফুটে,
মানিক উজলে বনরানীর মুঠে ;
এলায়ে চিকন চুল দু-কানে রতন দুল,
জোনাকি-চুমকি-খচা আঁচল লুটে।

ঢেউ-এর উপরে ঢেউ শোভিছে গিরি,
যেথায় নাহিয়া দিঠি আসিছে ফিরি,
নাগবালাদের দেশে নিয়ে যায় দূতী এসে,
ওইখানে আছে বুঝি সুড়ঙ্গ সিঁড়ি॥

চিরমিলন

তোমার সনে নয়কো আমার নূতন পরিচয়
অনন্তকাল বাসছি ভালো এম্‌নি মনে হয়।
মোদের মিলন দেখেই বুঝি
কপিল ঋষি পেলেন খুঁজি,
সূত্র তাঁহার,—প্রকৃতি আর পুরুষ সমন্বয়।

মোরা যখন ছিলাম শুধু মূর্চ্ছনা-সংগীত,
মোদের পরিণয়ে ছিলেন ব্রহ্মা পুরোহিত।
তারপরে সে দেশবিদেশে,
নূতনরূপে নূতন বেশে,
জন্মে-জন্মে হচ্ছে মোদের মিলন-অভিনয়।

যুক্ত ছিলাম হয়নি যখন পরিণয়ের প্রথা,
হয়তো তুমি মহীরুহ—হয়তো আমি লতা।
হয়তো চখা এবং চখী,
নয়ত বনের সখাসখী,
আজকে মোদের মানব-সমাজ পত্নীপতি কয়।

মানুষ মোদের ঘুচায়নি এই ক্ষণিক ব্যবধান,
মিলায়েছে সেই সনাতন চির যুগের-টান।
সেই সৃজনের আদি হতেই,
হইনি ছাড়া কোন মতেই
'তুমি' বলেই ভালোবাসি, স্বামী বলেই নয়।

বিরহতপের শেষ

সেদিন ফাল্গুনে যবে মদকল পিকরবে
অরণ্য জাগিল, ত্যজি রেণুঘন শ্বাস,
রসাল-মুকুল-মূলে মল্লিকা-বকুল ফুলে
ছুটিল করীর কুম্ভে মদিরা উচ্ছ্বাস।
সেদিন এলে না বঁধু সুরভি করবীমধু
গড়ায়ে পড়িল ঝরি ধরণীর বুকে,
বনশ্রী-কপোল 'পরে বসন্তের বিম্বাধারে
চুম্বন উঠিল ফুটি অশোকে-কিংশুকে!
তোমারি আশায় আমি খেলিনু এ অঙ্গে আমি
হোলিরঙ্গ দিবাযামী লাবণ্যের ফাগে,
যতনে জ্বালিনু দীপ পরিনু রতনটিপ
অধর করিনু রাঙা তাম্বুলের রাগে।
কুসুম-শয়ন পাতি জাগিনু চাঁদিনী রাতি
রাখিনু মালিকা গাঁথি নিচোল আঁচলে,
পল্লবিনী বল্লীসমা ফুল্লপীনা মনোরমা,
তরু-আলিঙ্গন মাগি লুটিনু ভূতলে।
যৌবনের ভরা কূলে মাধুরীতরঙ্গ দুলে,
তনু রোমাঞ্চিত কেলি-কদম্বের-প্রায়,
সেদিন এলে না প্রিয়, দেহকান্তি কমনীয়
হয়ে নীল হলাহল দহিল আমায়।
অকস্মাৎ এলে যবে, ভস্ম করি মনোভবে
পুন ধ্যাননিমীলিত রুদ্রের নয়ান,
জীর্ণ পর্ণে মর্মরিত বনহৃদি জর্জরিত
ঝলসিয়া শুষ্ক-শীর্ণ ধরার বয়ান।
শতগ্রন্থি বেশবাস, ধূসরিত কেশপাশ
উড়ে যেন গৃধিনীর রুক্ষ পক্ষজাল।
যেন ধু-ধু বালুকায় নিদাঘতটিনী-প্রায়
কোনরূপে রাখিয়াছি করোটি-কঙ্কাল।
তোমার করুণা লাগি বিরহ-যামিনী জাগি
অরুণ কোটরগত খঞ্জন-নয়ন।
আশাতৃষা রসাবেশ, ধূপায়িত, পাংশুশেষ,
অঙ্গার করেছে মর্ম মুর্মুর-দহন।
সহসা আসিলে বঁধু, নাহি সুধা, নাহি মধু,
নাহি কোনো আয়োজন ভাষায় ভূষণে,

গৃহে নাহি দীপজ্বালা   গাঁথা নাহি বনমালা
নাহি রসগন্ধডালা বরিব কেমনে?

*   *   *

বিরহ-তপের শেষ,   এসো-এসো হৃদয়েশ,
এসো নীলকণ্ঠ মোর, মন্মথমথন,
আজ ভস্ম সবি মম,   দহনে উজ্জ্বলতম
শুধু হৃদে রাজে প্রেম-হেম-সিংহাসন।

রূপ ও ধূপ

ওগো রূপ-অপরূপ,
তোমার দেউলে দহিয়া মরিল কত না সুরভি ধূপ
অটল-নিঠুর, চরণের মূলে,
তবু একবার চাহিলে না ভুলে।
পড়িল না ক্ষীণ রেখা, রসহীন 'অশান' পাষাণ বুকে
দণ্ড তোমার লুণ্ঠিত ভূমে।
দগ্ধ দেহের গন্ধিত ধূমে,
কালিমা মাখায়ে দেছে ধূপ তব কপটোজ্জ্বল মুখে।

ওগো রূপ-অপরূপ,
তব মন্দিরে মরণে বরিছে কত যে জীবন-ধূপ।
কও-কও কথা একবার ডাকি,
মেল, ও ইন্দ্রনীলমণি-আঁখি,
কত যে ভক্ত লোচন-রাজীব তুলি শরে দিল পায়,
হল না ও দেহে কৃপা-শিহরণ?
হানিল বক্ষে কেড়ে প্রহরণ
তব হোমানলে পূর্ণাহুতিতে সঁপিল যে আপনায়।
ওগো রূপ, অপরূপ,
মেল একবার অন্ধলোচন, দহে মলো কত ধূপ।

পল্লীবালা

পড়িছে ঝলসি কুন্দ-অতসী অনাদরে,
ব্যথিত গন্ধরাজ।
ঝরিয়া শুকায় শেফালিকা আজি নিরাশায়,
কুড়াতো যে নিতি সে বালিকা আজি নাহি গাঁয়,
শ্রীফল-পত্র আজি দেব-পূজা উপচার,
তুলসী মাত্র সাজ।
গৃহের লক্ষ্মী দুলালি গিয়াছে পরঘরে
এ-গৃহ আঁধার আজ।

ঠাকুরের সেবা হয়ে গেছে আজ চুপি-চুপি,
সেটা নাহি বটে বাকি।
সরসীর পথে কলসি বাজেনি ক্বনক্বন,
কোশাকুশী টাটে উঠেনিকো ঘাটে খনখন।
প্রসাদী-কুসুম না পেয়ে বাছুর আসে ফিরে
নামায়ে কাতর আঁখি।
পিতা নিজে রচে পূজা-আহ্নিক আয়োজন,
চোখ মুছি থাকি-থাকি।

খোকাখুকিদের হয়নিকো আজ নাওয়া-ধোওয়া
কে তাদের ডেকে পুছে ?
ঘরে ঘরে আজ বাজেনিকো মল ঝন-রন,
ভিখারি আসিয়া ফিরিয়া যেতেছে ঘন-ঘন।
হরিনামঝোলা হয় না সেলাই ঠাকুমার,
সূতা যায় না যে সূঁচে,
খুকিটির গালে দাগ হয়ে আছে আঁখিজল,
কেবা দেয় বলো মুছে?

ধুলায় ধূসর ধবলী ফিরিছে দ্বার-দ্বার
গোঠ হতে এসে ফিরে।
কাকে মাছ লয়, ছাগে খেয়ে যায় চাল-ধান,
পায়নিকো দাদা আঁচাবার জল, সাজা পান,
ভুলো-পুষি-মেনি ঘুরে-ঘুরে কেঁদে হল খুন,
গার লোম দুখে ছিঁড়ে ;
খাঁচার ময়না পায়নিকো আজ জল-ছোলা
গেল গলা তার চিরে।

বসেনি বাড়িতে বেণী-বিনানোর বৈঠক,
আসেনি পাড়ার দল।
বালিশের তুলা, আকাচা কাপড় ঘরময়,
বাসন পাত্রে জিনিসপত্রে নয়ছয়,
আঙিনার তরু পায়নিকো আজ বৈকালে
একটি ফোঁটাও জল।
শিউলিছোপানো শাড়িখানি হেরি মার চোখে
ব্যথা ঝরে অবিরল।

ললিত-কোমল ছোট দুটি ভুজলতা বটে,
কম কি ক্ষমতা তার?
তারে পর-করা লোকে বলেছিল দায়-সারা,
ভাবেনিকো কেহ অচল এ গৃহ সেই ছাড়া ;
সংসার পাতা শিখিবার ছলে নিল সে যে
বহু জীবনের ভার।
আজি এ গৃহের শিশু-পশু-পাখি-তরু-লতা
করে সবে হাহাকার।

আহা সে যে কোন অপরিচয়ের মাঝখানে
বন্দিনী দিবা-রাতি।
তথা গৃহভরা হাস্যোৎসব-কলরোলে,
আহত নিয়ত ফুলসম নদী-কল্লোলে।
অশ্রু মুছিছে অবগুণ্ঠন অঞ্চলে
নাহিকো ব্যথার সাথী,
মা-হারা এ গৃহ কাঁদে হেথা হায় লুটে-লুটে
নিভায়ে সাঁঝের বাতি।

পাহাড়িয়া প্রিয়া

ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় তুলসী-কুঞ্জে কি দিয়ে তুষিব তোমার হিয়া?
কোথা বীর-তরু তমাল নমেরু দেবদারু চারু নীপ?
পলাশ-শ্রীর ললাটের 'পরে কোথা সে চাঁদের টিপ?
শিরীষ-বালার অলক দুলায়ে পবন হেথা না ফুরে,
মহুয়ার বনে মাতিয়া হেতায় মৌমাছি নাহি ঘুরে,

বনদেবী হেথা শৈলসোপানে এলায় না তার বেণী,
কোথা দিগন্তে তরঙ্গায়িত তুঙ্গ গিরির শ্রেণী?
হেথা শিলাজতু গলায়ে ঝরেনা গেরুয়া উৎসবারি।
সিকতা-হৃদয় বিদারি এখানে ভরেনাকো কেহ ঝারি,
কোথায় উদার অবাধ জীবন ভূধরের পাদমূলে!
চপল চরণে কোথা ছুটাছুটি গিরিনদী-কূলে-কূলে?
ওগো পাহাড়িয়া প্রিয়া,
হেথায় বঙ্গ-অঙ্গনে তব কি দিয়ে তুষিব হিয়া?

ওগো পাহাড়িয়া বালা
বল্লীবলয় ভুজে তব, গলে কুটমল্লিকা-মালা।
প্রকৃতি হেথায় সুকৃতির রূপে বেঁধেছে কুটিরখানি,
আলিপনা-আঁকা ছায়ামণ্ডপে এস গিরিবনরানী।
পূর্ণ কুম্ভ তব মেখলায় পাণি-বন্ধন যাচে,
কম্বু হেথায় তব চুম্বন আশায়-আশায় আছে।
ফুল-বল্লরী-ভূষা পরিহরি ভবন-ভূষণ 'পর
টান শির 'পরে লাজ-গুণ্ঠন, শঙ্খবলয় ধর।
আঁকো সীমন্তে সিন্দূর-রেখা, বাঁধো কুন্তলরাশি,
হোক অচপল চরণযুগল, সংযত হোক হাসি
পিঞ্জরে হেথা পড়িয়াছ বাঁধা গিরিকুঞ্জের পাখি,
হরিণ-নয়নে ঘেরিয়া বেড়িল শত তরুণীর আঁখি।
ওগো পাহাড়িয়া বধু,
হরিত পর্ণপুটে আনো গিরি-প্রকৃতি-হৃদয়-মধু।

শেফালি

বিদায়-পথের যাত্রী হলাম নিভ্‌লে রাতের দীপালি,
পিছন হতে হিমেল প্রাতে ডাকলি কেন শেফালি?
উৎসবও সব ফুরিয়ে গেছে, ম্লান হয়েছে জোছনা,
দিগ্বলয়ে কুণ্ডলিত দিন-ফুরানোর শোচনা।
জাড়ের আড়ি পড়তে শুরু, ঘাড় গুঁজে রয় মরালী,
বিসর্জনের বাজনা বাজে, নৃত্য করেন করালী।
ছাতিম ফুটার দিন গিয়েছে, থলকমল আর ফুটে না,
মনে-বনে কোথাও অলি-মৌমাছিরা জুটে না।

ক্ষেতের ফসল ডাকছে আমায় নেতের কেতন দুলায়ে,
ফুলের পালা সাঙ্গ, কেন ফেরাস আবার ভুলায়ে?
ডাক না শুনে চলব সোজা, কোথায় বা সে ক্ষমতা?
বিদায় নিলাম, বিদায় আমায় কই দিল হায় মমতা?
শেফালি, তোর আয়ু-শেষের পাণ্ডুতা যে বয়ানে।
দীন চাহনি ঝলছে যে তোর অশ্রুভরা নয়ানে।
অমর করে রাখব যে তোর বিদায়-ভাষণ সুরভি,
ছন্দে আমার কই শকতি, গাইব কিসে পূরবী?
মিছামিছি ডাকলি আমায় হায় রে কেবল কাঁদাতে,
বিদায়যাত্রা ভাঙলি আমার পিছন-ডাকা বাধাতে।
কুন্দকলি মুখ তোলে ওই, ঘাড় নাড়ে বনতুলসী,
কেমন করে বিদায় নেব—দিচ্ছে উঁকি অতসী॥

রাঙাচুড়ি

পিতা ফিরিলেন বাড়ি, রাঙা চুড়ি, রাঙা শাড়ি
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সেই চুড়ি পরি হাতে সে আজ আমোদে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে-ঘরে।
শানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ-পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধুলায়,
ভাঙিয়া কাচের চুড়ি একেবারে হল গুঁড়ি,
ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।
উঠিবে না ধুলা ঝাড়ি ফিরিতে চাহে না বাড়ি
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া ;
ভাঙা চুড়ি বারবার জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া-লুটিয়া।
পিতা আসি তুলে বুকে বলে, চুমা দিয়ে মুখে,
"গেছে যাক, ভারি এর দাম।"
থামেনাকো কোন মতে তবু খুকি শুয়ে পথে
ফুঁপে-ফুঁপে কাঁদে অবিরাম।
ব্যথা কী বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায়-আনায়?
দরদের ধন হেন যত তুচ্ছ হোক কেন,
মিলিবে কি রুপায়-সোনায়?

সমগ্র বালিকাপ্রাণ চুড়ি সনে খান-খান,
বল কেবা দিবে দাম তার?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে এ ভুবন আঁধার॥

হা-ঘরে

হা-ঘরে ওই ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে করে গৃহস্থালী,
জীবনজোড়া পুঁজি তাহার বাঁকঝুলানো দুটি ডালি,—
কোলের ছেলে, সাপের ঝাঁপি, ভাতের হাঁড়ি, মাটির থালা,
ডুগ্‌ডুগি আর তেলের চোঙা, সবুজ কাচের কণ্ঠমালা।
আশ্‌মানই তার ঘরের চালা রবিশশীর আলোকজ্বলা,
মাঠ-মরু তার বাড়ির উঠান, প্রমোদ-ভবন গাছের তলা।
ঝোপের ভিতর জন্ম তাহার পান করে জল ঘাট-আঘাটে,
সেইখানে তার রাতের ডেরা যেথায় রবি বসেন পাটে।
কোনো রাজার নয়কো প্রজা দীনদুনিয়ার মালিক বিনে
মুখ চেয়ে সে রয় না কারো থাকে না সে কারো ঋণে।
সকল বাঁধনহারা সে যে জানেনাকো সমাজরীতি,
জীবনপথে লক্ষ্যহারা, মানেনাকো স্বাস্থ্যনীতি।
আজকেরই তার মাত্র পুঁজি ভাবে না তাও কাল কি খাবে।
অশ্বমেধের অশ্বসম বিশ্বে আপন বশ্য ভাবে।
যায় না কোনো সদাব্রতে যায় না ধনীর দেউড়ি-ঘরে,
তরুতলের অতিথ গাঁয়ে, তাও শুধু এক তিথির তরে।

একটি দিবস গাছের ডালে ঝোলে তাহার ভাতের হাঁড়ি।
গাঁয়ের ছেলে দেখতে জমে একটি দিনের তাহার বাড়ি।
ভালুক তাহার হুকুম পেলে কোঁ কোঁ করে জ্বরটি আনে,
সাপটি ফণা নত করে লুকায় ঝাঁপির মধ্যখানে!
জানেনাকো ভিক্ষা মাগা-চাকরি-চুরি-প্রবঞ্চনা,
প্রাণের অভাব সব চুকে যায় পেলে পরে একটি কণা।
জীবিকা তার সাপখেলানো নানানরকম বাজির খেলা,
মনে পড়ায় বাজির ছলে বিশ্ববাজিকরের মেলা।
কোনো শাসন রুক্ষ ভাষণ পারেনি তায় আনতে বাগে,
সকল আইন হদ্দ হয়ে হার মেনেছে তাহার আগে।
পথের সাথীর পতন দেখি থামে না সে যাত্রাপথে,
যুধিষ্ঠিরের মতন চলে স্বর্গে অটল চরণ-রথে।

কুড়ানি

কুয়াশায় ভরা পোষের বিষম হাড়-কনকনে জাড়ে,
আমির চাচার খামারে মোরগ না ডাকিতে একেবারে,
চাটাই ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া-কাঁথা গায়ে দিয়ে,
মাঠপানে ধাই ধান কুড়াইতে ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।
ক্ষেতে-ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে-খুঁটে তুলি ধান,
গোটা শিষ যদি দেখি ভুঁয়ে পড়ে উথলিয়ে ওঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা আঁটিআঁটি বোঝা-বোঝা।
পিছু-পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বার করি মোর ঝুলি,
যেটি পড়ে ভুঁয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে লই তুলি।
ঠোঁট মুখ গলে জাড়ে জরজর পা-দুটা গিয়াছে ফাটি,
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল মাঠের কুচল মাটি?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুরচুর ভরে যায় মোর ঝোলা।
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা? কুড়ুনি বাঁধিবে গোলা।"

শীত যায়-যায়, ক্ষেতে নেই ধান, ধু-ধু করে সারা মাঠ,
মরমর করে শুক্‌নো পাতায় গাছতলা-পথঘাট।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝাঁকা লই কাঁখে।
শুকনো পাতায় উঠানে কোথাও জায়গাটুকু না থাকে।
দুপুরে গোবর-ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা কয়ে ঘুরি-ফিরি গোরুবাছুরের কাছে-কাছে।
বিকালে বেরুই, কাঠ-খড়ি খুঁজি বনে-বনে মাঠে-মাঠে,
পড়শিরা কয়, "শোবে একদিন কুড়ুনি রুপোর খাটে।"
বাদ্‌লা লাগিলে পথে-ঘাটে কাদা, নিভে আসে খর তাপ,
তালপাতা দিয়ে বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠকুটো কিছু মিলে না কোথাও, জ্বলে না সহজে আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি-ঝাঁকা।
নালীর 'পাউষে' জালিটি পাতিয়ে বসে থাকি অমি ঠায়,
চুনোপুঁটি দুটো আঁচলে গিঁঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।

বর্ষা ফুরায় লাউকুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে,
ডোবায়-ডোবায় কল্‌মি-শুশুনি তুলে আনি ঝুড়ি করে।
নালাটি শুকায় কাঁকড়া লুকায়, মাছ টুঁড়ে মরা মিছে,
শুগুলি-শামুক কুড়িয়ে বেড়াই জেলেদের পিছে-পিছে।
তালটি-বেলটি-কুড়ালে লোকেরা হাঁ-হাঁ করে আসে ছুটে,

মোর ভাগে থোয়, লোকে যা না ছোঁয়, নিতে হয় তাহা খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়,
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছি তো এত বড়।

খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে রয়, বাপমরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া-পড়শিরা দেয়নিকো কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আলে কারো দেইনা পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
চাকরি করি না ভিখ্‌ও মাগি না এমনি করেই রই।
অনেক বকেছি কুড়ুনি বলিয়া ডেকনাকো মিছে পিছু,
মাঠে যে হাঁটিলে ঝুড়িটি ভরিবে. টুঁড়িলে মিলিবে কিছু।

ভাদুরানী এসো ঘরে

নিভায়ে তপন সারাটি গগন ঢেকে গেছে মেঘে-মেঘে,
সঘনে গরজি বিজলি চমকে ভ্রূকুটি হানে সে রেগে।
বাদল থেমেছে ভেবে মাঝে-মাঝে পাখি কলতান ধরে।
এহেন বাদরে আদরিণী মেয়ে ভাদুরানী এসো ঘরে।

টোপর-পানায় পুকুর ভরেছে কোন খানে নেই ভাঙা,
জলা বলে মনে হয় ডাঙাগুলো জলে মনে হয় ডাঙা।
ভুলে ভরা সব, কোথায় ফেলিতে কোথা সে চরণ পড়ে,
এহেন দুপুরে থেকোনাকো দূরে,—ভাদুরানী এসো ঘরে।

ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে,
কাঁকড়া-শামুক-মাছ-ব্যাঙে ভরা নালী গেছে এঁকে-বেঁকে।
আজি পাট-ক্ষেতে হাতি ডুবে যায়। মন যে কেমন করে,
কাঁদিছে দাদুরী আদরিণী মেয়ে ভাদুরানী এসো ঘরে।

বনপথ-তল হয়েছে পিছল, ডুবেছে ঘাটের সিঁড়ি,
গোরুগুলো বাঁধা গোহালে-গোহালে কৃষাণ আসিছে ফিরি।
বাদলা বাতাসে ভূতের মতন ঝাউগাছগুলি নড়ে,
কি বিপদ আনে কখন কে জানে? ভাদুরানী এসো ঘরে।

কুকুর ধুঁকিছে ঢেঁকিশালে শুয়ে ময়না ঝিমায় শিকে,
কুণ্ডলী বাঁধি উঠে ঘন ধূম চাল ফুঁড়ে চারিদিকে।
বাবুই-এর বাসা তালগাছ হতে ছিঁড়িয়া পড়েছে ঝড়ে,
জুঁইবন হায় কাদায় লুটায়, ভাদুরানী এসো ঘরে।

হাত পেতে আছে ছেলেরা, ভাজিছে মা তাদের তালবড়া,
বালিকারা মিলি আড়াআড়ি করি গাহিছে তোমার ছড়া।
ঘরের সাঙায় কপোত ঘুমায়, বসে না চালের 'পরে,
নীড়ের বাইরে কেউ নেই আজ ভাদুরানী এসো ঘরে।

আসিয়াছে ঢল, খেয়াঘাটে গোটা প্রহরে জমিছে পাড়ি,
পাল তুলে শত নৌকা চলেছে,—কোথা কোন দেশে বাড়ি?
উচাটন মন তোমা সারাখন চারিদিকে খুঁজে মরে,
কোথা ডামাডোল বেধেছে কে জানে? ভাদুরানী এসো ঘরে।

বয়ঃসন্ধি

কৈশোর-কোরক হতে অয়ি প্রিয়ে সহসা কখন
যৌবনের শ্রীসম্পদে মধুমদে হলে বিকশিত!
কবে গেল ছন্দ-দল কেশরের কুণ্ঠিত কুঞ্চন
সর্ব অঙ্গ অকস্মাৎ কণ্টকিয়া হল হরষিত।
জীবন-গহনে তব, পুষ্পময় ধনুখানি ধরি
সহসা পশিল কবে সংগোপনে প্রথম নিষাদ,
উঠিল চকিত রোল কোলাহল তপোবন ভরি
একসঙ্গে বিহঙ্গেরা চমকিয়া ঘোষিল সংবাদ।
জানি না কখন কবে জীবনের গূঢ় কক্ষতলে
সাফল্য সূচনা হল সংগোপন পরাগের দলে।

অয়ি ইন্দ্রায়ুধময়ি, স্বপ্নঘোরে জানি না কখন
বর্ণ হতে বর্ণান্তরে বিলসিয়া করেছ প্রয়াণ।
সুসংবৃত হয়ে এল ও তনুর শিথিল বসন,
সংযত হইয়া এল চলগতি কলহাস্য-তান।
আত্মহারা চরণের চপলতা কবে সংগোপনে
হরণ করিল আঁখি সন্তর্পণে পারিনি ধরিতে।
শিথিল বিতান কবে উন্মদ-উদাস সমীরণে
মঞ্জুল বর্তুল হল জানি না ও হৃদয়-তরীতে।
ক্ষীণ কবে হল পীন, ধনী হল যাহা ছিল দীন,
একতারা কবে হল রাতারাতি সাত-তারা বীণ।

বুঝি সে ফাল্গুন নিশা জ্যোৎস্নাময়ী। দক্ষিণ সমীরে
উড়িয়া পড়িয়াছিল হেলাভরে বক্ষের অঞ্চল,

সেই অবসরে পুরে নব নৃপ প্রবেশিল ধীরে
অতর্কিত কৈশোরের গেল তায় সকল সম্বল।
বিনা রণে নিল জিনে তার রাজদণ্ড-সিংহাসন,
লীলাসহচরগণ ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল সরিয়া,
লাজে ভয়ে সসঙ্কোচে অন্তঃপুরে নর্ম-সখীগণ
লুকাইল ত্রস্ত পদে, ফুল-খেলা রহিল পড়িয়া।
ধরিতে নারিনু কবে বিদ্যালোভী চোরের মতন
মর্মের সুড়ঙ্গ-পথে অলক্ষিতে পশিল যৌবন।

যে দিন কৈশোর তব চিরতরে লইল বিদায়
তোমার জীবন-কুঞ্জে দৃশ্য আহা হইল কেমন?
উঠিল কি হাহাকার শোকরোল বিরহ-ব্যথায়
মাথুর যাত্রার দিনে বৃন্দাবন বিধুর যেমন?
সেদিন কি নেত্রে তব অলক্ষিতে ফুটেছিল জল?
অজানা রহস্য-ভয়ে অন্তর কি হইল আকুল?
রচিতে রচিতে নব যৌবনের বরণ-মঙ্গল
কেবলি কি হতেছিল সেই দিন পদে পদে ভুল?
জানি না কখন কবে কৈশোরের তৃষাহরা মধু
যৌবনের সীধু হল জ্বালাময়ী, অয়ি প্রাণ-বধূ।

প্রেমের স্মৃতি

কিশোরপ্রীতির মধুর স্মৃতি লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
চমকে উঠে যখন-তখন, মানসতলেই সুপ্ত রয় ;
পেয়রাগাছের ফাঁকে-ফাঁকে,
পায়রাগুলোর ঝাঁকে-ঝাঁকে,
পল্লীপথের বাঁকে-বাঁকে, বকবাতাবির কুঞ্জবনে,
পিউতানে, জুঁইশিউলিবাগে সে প্রেম জাগে গুঞ্জরনে।

কিশোর ভালোবাসার আলো লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়,
লতায়-পাতায় বনের পথের যথায়-তথায় গুপ্ত রয় ;
সাঁজপূজনীর শাঁখের ডাকে
নোলক নাকে, চপল আঁখে,
লুকোচুরি খেলতে থাকে দিঘির বাঁধা ঘাটটি ভরি
বালকবালার খেলাধুলায় বেড়ায় পাড়ার বাটটি ধরি।

বোশেখ মাসের অশোকতলায় হোলির দিনে রাসবাড়িতে,
পাথর-পূজার পৌরোহিত্যে, শিশুপাঠের মাস্টারিতে,
পূজার দিনে আটচালাতে,
দীপান্বিতায় দীপ জ্বালাতে,
সাঁজের দ্বারে জলঢালাতে যে বীজ বুকে উপ্ত হয়,
অঙ্কুরিত রূপটি তাহার লুপ্ত হয়েও লুপ্ত নয়।

রাখালরাজ

অবুঝ কানু কার মায়াতে ভুলে
গোকুল ছেড়ে চলে গেলি ভাই?
সেথা কেবল হাতি ঘোড়ার মেলা,
তোর তো সেথা খেলার সাথী নাই!
কোথায় সেথা দূর্বাশ্যামল গোঠ,
রাখাল দলে খেলার হেন জোট,
ননীর মতো কোমল ধবলদেহ
কোথায় সেথা এমন দুধল গাই!
এমন রাখাল-রাজ্যখানি ফেলে
কেমন করে আছিস্ কানাই ভাই?

ময়ূরনাচা এমন পাখিডাকা
হরিণচরা কোথায় সেথা বন?
মাটিছোঁয়া কোথায় তরুশাখা
ঝুল্‌বি কোথা দুল্‌বি সারাক্ষণ?
ফুল-বনে নাই ফুলের ছড়াছড়ি
ফুলের ডোরে কোথায় জড়াজড়ি?
গুঁজতে কানে মুকুল কোথা পাবি?
খুঁজতে গিয়ে আকুল হবে মন।
অবুঝ রাজা এমন বাঁশিবাজা
সবুজ তাজা কোথায় সেথা বন?

দুপুর-রোদে সেথায় তরুর তলে
কোথায় পাবি মধুর মৃদু-হাওয়া?
কোথায় সেথা কালিন্দীরি নীরে
কল্‌কলিয়ে সাঁতার কেটে নাওয়া?

সেথায় কিরে গভীর কালীদয়
কমল কুমুদ নিত্য ফুটে রয়?
গায়ের ঘামেও ঘনায় ঘুমের ঘোর
কোথায় এমন ঘুমে নয়ন ছাওয়া?
রোদের তাতে তাত্‌লে তনু তোর
গাছের ছায়ায় কোথায় পাবি হাওয়া?

তুল্‌বে কেবা বেলের কাঁটা দিয়া
কুশের আঁকুর বিঁধলে রাঙা পায়?
পড়্‌লে খসে নূপুর ধড়া-চূড়া
আবার কেবা পরিয়ে দেবে হায়?
তমাল তলে বস্‌লে মেলি পা!
বাছুরটি আর চাট্‌বে নাতো গা!
ক্লান্ত হলে চাইবি কারে জল
কার কোলে তুই এলিয়ে দিবি গায়?
ক্ষুধা পেলে আন্‌বে কেবা ফল
ঘাম্‌লে ও-মুখ মুছিয়ে দিবে তায়?

সেথাও যদি উপদ্রবই করিস্‌
তারা কি তোর সইবে আচরণ?
সেথাও যদি মাখন দধি হরিস্‌
তোয় যে কটু কইবে অকারণ!
বেণু যদি বাজাস্‌ রাখালরাজ
কেমন করে কর্‌বে তারা কাজ?
বকবেনাতো তোর বাঁশরি-রবে
যদি বা হয় পরান উচাটন?
কলস যদি হরিস্‌ ঘাটে, তবে
হাস্‌বে কি রে তথায় বধূগণ?

রাজা হওয়া যদিই এত সখ
রাজা তো তোয় করেছিলাম মোরা ;
ছিল তো তোর মন্ত্রী-পারিষদ,
গোধন মৃগ,—তারাই হাতি ঘোড়া।
উইয়ের ঢিপির সিংহাসনের 'পরি,
মাথায় দিলাম পাতার মুকুট গড়ি,
কণ্ঠে দিলাম গুঞ্জাফলের মালা
হস্তে বাঁধি রাঙা-রাখির ডোরা।
হেথায় ফেলি রাখালরাজের লীলা
কেমনে তুই থাক্‌বি মাখনচোরা?

প্রিয়ার কৈশোর

আজিকে বসন্তরাতে স্মরি তোমা, প্রিয়ার কৈশোর,
মম নবযৌবনের কুঞ্জবনে লীলাসহচর।

মনে পড়ে স্মিতরম্য কুণ্ঠানম্র তোমার মুরতি,
আরক্ত আনত মুখে হর্ষে ভয়ে ব্যাকুল মিনতি।
স্মরি সে বাহিরে বাম, লজ্জাভীরু, অন্তরে দক্ষিণ
তোমার মধুর ভঙ্গি, সন্ধ্যাম্লান নয়ন-নলিন।
পদনখে ক্ষিতিচিত্র, অঙ্গময় প্রণয়-অঙ্কুর,
মম দৃষ্টিমহোৎসব লীলায়িত গঠন বন্ধুর,
লীলাভরে সাজাইতে ফুলধনু নব-নব ফুলে
সুরভি কুসুমাসব উচ্ছ্বলিত অধরের কূলে।
তরুতলে স্বিন্নাঙ্গুলে ফুলমালা গাঁথিতে যখন,
পিছু হতে ধীরে আসি রুধিতাম তোমার নয়ন।

আমার কিশোর-বন্ধু দিয়াছিলে অপূর্ব জীবন,
তব সাহচর্যে মম সত্য হল স্বপ্নের ভুবন,
ইন্দ্রায়ুধময় হল শির 'পরে অনন্ত আকাশ
অফুরন্ত পরিমলে ভরে গেল উন্মদ বাতাস।
মহোৎসবময়ী হল নৃত্যগীতে দানসত্রে ধরা,
সব পেয় হল সীধু সব ভক্ষ্য হল মধুভরা।
'পঙ্কজে-পঙ্কজে আহা ভরে গেল যেথা যত জল
ভৃঙ্গে-ভৃঙ্গে ভরে গেল নিখিলের সকল কমল।
গুঞ্জন করেনি হেন মধুব্রত ছিল না তখন
মানস হরেনি হেন কলগুঞ্জ করিনি শ্রবণ।

সুস্বপ্নে ভরিল সুপ্তি, মুক্তাফলে হৃদিশুক্তিতল,
অকাজে ভরিল দিন, বিভাবরী চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
ভরিল হেমন্তসন্ধ্যা রাস-রসে মাধুরী-উচ্ছ্বাসে,
সুখদ হইল শীত পরিরম্ভে উষ্ণ-ঘন শ্বাসে।
বসন্ত ভরিল মোর ফাগে-ফাগে হোলির মিলনে
বরিষা ভরিয়া গেল নিশি-নিশি ঝুলনে-ঝুলনে।
কবিত্বে ভরিল চিত্ত, সব বাণী ভরিল সংগীতে,
প্রকৃতি ভরিয়া গেল লীলায়িত প্রসন্ন ভঙ্গিতে।

আবার মাধবী নিশা কালচক্রে আসিয়াছ ফিরে।
বাজে না তোমার বাঁশি মম প্রেম-যমুনার তীরে।
পলাশে বিলাস নাই, রক্তাশোক আজি শোকারুণ,
কোকিল পাপিয়া-কণ্ঠে বাজিতেছে বেহাগ করুণ।
শুষ্ক আজি শুক-কণ্ঠ, নাহি রস রসাল-মুকুলে,
আকুঞ্চিত চঞ্চ লক্ষ্মী নাহি বন-লক্ষ্মীর দুকূলে।
আজি ব্যর্থ রজনীতে দীর্ঘশ্বাস তেয়াগি কেবল,
প্রিয়ার কৈশোর, তব মধু স্মৃতি করিয়া সম্বল!

ভূষণ

চেয়েছিলে ভূষণ, প্রিয়ে, ভূষণ সবি সঙ্গে আছে।
আছে হৃদয়-মঞ্জুষাতে আছে আমার অঙ্গে আছে।
আজকে বুকের রক্ত দিয়ে, আলতা দিব পরাইয়ে,
সোহাগে সই দুলিয়ে দেব চুমার নোলক নাকের কাছে॥

রচিব হার একটা হাতে, মেখলাটি অন্যটাতে—
তোমার কানে প্রেমের গানে রচিব দুল নূতন ছাঁচে।
পায়ে দিব হিয়ার নূপুর, বাজবে প্রিয়া ঝুমুর-ঝুমুর,
ভূষণ পরে দেখবে বয়ান আমার দুটি নয়ান-কাচে।

সম্পূর্ণতা

গগনে কোটি তারকা হয়ে তোমার পানে চাহিয়া রই,
পরান ভরি নিরখি কোটি নয়ানে,
গহনে কোটি কোরক হয়ে স্ফুটন-ব্যথা নীরবে সই,
তোমার তরে রচিতে ফুলশয়ানে।

অযুত নদীলহরী হয়ে চরণে লুটি তাথৈ—থই,
চিক্কন চারু চিকুর হই ও-শিরে।
তোমারি স্বেদ অপনোদনে মধু-পবন-জীবন বই,
তনুতে অনুলেপন হই উশীরে।

অশ্রু হয়ে গণ্ডে দুলি,—হাস্যে ফুটি আস্যে অই
পুলকে উঠি কণ্টকিয়া হরষে,
ঘুমালে তুমি স্বপন হয়ে জাগিয়া তোমা ঘেরিয়া লই,
আবেশ মোহে মূরছি রই উরসে।

তোমার প্রতি অণুটি চাই। ইহ-জীবনে লভিনু কই?
শরীরী হয়ে তোমারে, সতি, লভিনি,
বাসনা তাই তনুটি তব ভূষিতে পুড়ে ভস্ম হই,
মরিয়া লভি করিয়া তোমা যোগিনী।

বিশ্বরূপ

দিব্য দৃষ্টি দাও দয়াময়, দেখিব আজিকে বিশ্বরূপ,
বিশ্ব ব্যাপিয়া—বিরাট বিশাল বপুতে বিকাশ, বিশ্বভূপ।
কোটি-কোটি রবি, গ্রহতারা সবি বিলোচনে তব দীপ্ত হোক।
তোমারি চরণ ঘিরিয়া বরণ-আরতি করুক সপ্তলোক।
স্থূল যাহা আছে হোক্ স্থূলতম, সূক্ষ্ম যা আছে সূক্ষ্মতর ;
তোমাতে করুক ছুটাছুটি যত দেব-প্রেত-পশু-যক্ষ-নর।
তোমার চিকুরে জ্বলুক বহ্নি, নিঃশ্বাসে বোক্ মরুদ্‌গণ ;
চরণের তলে ছুটুক সিন্ধু, বক্ষে লুটুক তড়িদ্‌ঘন।
তোমার বিরাট বদন-বিবরে সকল সাধনা—কর্ম্মচয়,
হেরি আগে হতে তুমিই করেছ, যাউক ধর্ম্মাধর্ম্মভয়।

তুমিই কর্ত্তা, তুমিই হর্ত্তা, আমি তো করণ যন্ত্র তব,
সকল অরাতি তোমাতে শায়িত, দাও এ ধারণা মন্ত্র নব।
গাণ্ডীব হাতে দাও তুলে দাও, করে দাও প্রাণে উগ্রতর,
জীবন-আহবে হইব এ ভবে তব সারথ্যে অগ্রসর।

দূর্বা

অকিঞ্চন তুচ্ছ আমি, জনমেছি পদতলে ধরিত্রীর বুকে।
দাও সবে পদধূলি তৃণ-জন্ম ধন্য হোক, মরে যাই সুখে।
মম দৈন্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে কেন মোরে রচ ভাই অর্ঘ্য দেবতার?
তৃণান্বিত দাস্য আমি, কাড়িয়া লয়োনা মোর সেবা-অধিকার।
পাষাণ-বিগ্রহ-পায় নিগ্রহের বেদিকায় হব শুষ্ক-মৃত ;
জীবনময়ীর গায় অক্ষয় যৌবনসম আমি রোমাঞ্চিত।
মন্দিরে পূজারিরূপে অভিমানে ভক্তিহারা যেন নাহি হই।
বিশ্বের সেবায় যেন জন্মে-জন্মে যুগে-যুগে শূদ্র হয়ে রই।

সংগীত ও মাধুরী

শাখিশাখে পাখি গাহি সুমধুর গান
ফলের সুরসে মাধুরী করিল দান।
কুসুমের বনে গাহি গুঞ্জনে গীতি—
অলি ফুল-মধু মধুর করিছে নিতি।
গুন-গুন গানে গাহিয়া দোহন-কালে
গোপের দুলালি গোরসে মাধুরী ঢালে।
যুগ-যুগ ধরি গাহিয়া প্রেমের সুর
করিয়াছে কবি প্রেমে এত সুমধুর।

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান, প্রেম, দুজনেই ত্যাগবীর, তপস্বী, বৈরাগী,
ঐহিকতা একেবারে ঘৃণ্য বলি তবু নাহি মানে।
জ্ঞান বিশ্বামিত্রসম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি,
প্রেম কণ্বসম নিজ বুকে টানে পরের সন্তানে।

প্রকৃত লক্ষণ

মুখ হাসে যাহে, হাসেনাকো চোখ, তার নাম নয় হাসি
বুক না কাঁদিলে হয় কি কান্না, চোখে শুধু জলরাশি?
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাকো গান নাহি গায় যদি প্রাণ,
আত্মা না দিলে শুধু হাতে-করে-দেওয়ারে কে বলে দান?

মধ্যপথে

ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে পড়ে মাতা চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি ছুঁতে না পারে,
নমি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তারে।

ক্লান্ত-শ্রান্ত নদী যদি ছুটি বঁধুর পানে,
জোয়ারে উছলি পারাবার তারে হৃদয়ে টানে।
দীন-ক্ষীণ যদি ভক্ত কাতর-সজল আঁখি,
লয় তবে বাহু বাড়ায়ে দয়াল হৃদয়ে ডাকি।

দেবতার মুক্তি

মানব, মন্দির রচে শিলা দিয়ে উন্নত-সুন্দর ;
দেব-কারাগার, তাহে বন্দী দেব ব্যথিত-কাতর।
অশ্বথ, মন্দির রচে বিদারি সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অঙ্কে তার লভে নিদ্রাসুখ।

প্রকৃত অর্ঘ্য

এটা-ওটা সেটা দিয়ে কত তুমি পূজিয়াছ তাঁয়।
কিছুই ছোঁননি তিনি অনাদরে সকলি শুকায়।
মধুগন্ধে জীবনেরে শতদলে কর বিকশিত,
পদ্মে-পদ্মে পা ফেলিয়া যান তিনি কমলাদয়িত।
'দিনু তোমা, লও' বলি কিছু তাঁরে হয়নাকো দিতে।
যা-কিছু সুন্দর সবি অর্ঘ্য তাঁর এ বিশ্ব-বেদীতে।
কলা-মূলা ঘুষ দিয়ে শ্রীধর কি পাইল চরণ?
শ্রীনাথের শ্রীচরণে স্বত অর্ঘ্য শ্রীধর-জীবন।

রৌদ্ররস

উগ্র ভানুর ময়ূখ-মালায় ঝলসিয়া পড়ে মহী,
একা ও রাজীব রয়েছে সজীব তীব্র দহন সহি।
চারিদিকে তার শীতল সলিল হিল্লোলি গায়ে পড়ে,
নলিনীপত্রে সতত পবন আদরে ব্যজন করে।
পঙ্ক জোগায় তারে প্রাণরস মৃণাল-ছিদ্র-পথে,
তবে সরসিজ সূর্যের তেজ সয়ে রয় কোন মতে।

এত রসময় জীবন যার সে রুদ্রে পূজিতে পারে,
রসভাণ্ডার ভরা যেথা সেথা সকল ব্যথাই হারে।

হাসির ফুল

শুভ্র ক্ষণিক মুখের হাসি, শিশির-ভেজা দ্রোণের রাশি,
বুকের হাসি সজীব-তাজা রাঙা কমল ফুলের রাজা।
সুখের হাসির কনক-বরন, চাঁপার মতন মনোহরণ,
দুখের হাসি অধর-পুটে অপ্‌রাজিতার মতন ফুটে।

জীবনে ও মরণে

এ-পারে মরুভূ ধু-ধু চরণ দহিছে তপ্ত ঈর্ষাসিকতায়,
যশ যেথা লুব্ধ করে শেষে হায় ক্ষুব্ধ করে মরীচিকাপ্রায়।
মরণের পরপারে রচেছে সে শ্রদ্ধাভারে শ্যাম স্নিগ্ধকায়া,
কূজন গুঞ্জন-স্তবে-ভোগ্যফলে পুষ্পাসবে ঋদ্ধ বনচ্ছায়া।

তীর্থ

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখী জল-ঝড়ে,
দুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে।
স্নেহপরশে পুলকাঞ্চিত কপোলে অশ্রু গলে,
বাৎসল্যের গোমুখী-তীর্থ জাগিল কুটির-তলে।
জ্যৈষ্ঠের দিনে গোষ্ঠের দাহে ক্লান্ত, তপ্তকায়ে,
রাখাল যখন শ্রান্তি দূরিয়া সুশীতল বটছায়ে,
গাছের গুঁড়িটি আঁকড়িয়া কয়, "বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি!"
বটতল হয় প্রেম-মৈত্রীর বোধিতরু-তলভূমি।

পুষ্পিত কাল

শতেক কিরণধারায় ফুটিছে উষা কমলের শতদলে,
সন্ধ্যামণির পীতিমায় ফুটে নিতি সায়াহ্ন-পরিমলে।
কুপিত অরুণ জবায় বিকশে মধ্য-দিবস রাঙা হয়ে,
সন্ধ্যা ফুটিছে কুমুদের দলে জোছনাগলানো সুধা লয়ে।
আঁধার নিশীথ বিকাশ লভিছে অপরাজিতায় থরে-থরে,
শেষ রজনীর করুণ-বিদায়-দীন শেফালিতে ফুটে ঝরে।
পুষ্পিত হয়ে চলিতেছে কাল ফুটিছে ঝরিছে ক্ষণে-ক্ষণে,
আলো-আঁধারের লীলা চলে কিবা ফুলের সুপ্তি জাগরণে।

সত্য-সাধনা

সত্য-সাধনার ফল তরুর রুধিরে পুষ্ট কঠোর-মধুর,
নহে সে অলস ফুল রঙিন কামনাকুল লতিকা-বধূর।
নহে কুলক্রমাগত, ছলজিত, বলহৃত রাজ-সিংহাসন,
ক্ষত বক্ষে এ যে জয় হারাইয়া ধর্মরণে সন্ততি-স্বজন।
গিরি-গাত্রে স্বতঃস্রুত ঋতুর প্রভাবে দ্রুত উৎস-ধারা নয়,
এ যে খননের ফল, গভীর কূপের জল অমল-অক্ষয়,
শীতল চন্দ্রিকা নয়, এ যে দীর্ণ ঘন হৃদে চপলা-প্রখর,
স্নেহের আশিস নয়, কাননে-কান্তারে তপে অর্জিত এ বর।

ব্রজকেশু
১৯১৫

চিরবন্দ্য

ইন্দীবরনিন্দী আঁখি বৃন্দাবন-নন্দী।
সত্যশিব সুন্দর হে, চরণ চারু বন্দি॥
তব—বদন কোটি ইন্দু ধরে, আকুল তার বিন্দু করে
গোকুল হৃদি সিন্ধু'পরে সতত সুধাস্যন্দী।
অন্ধজনানন্দ, প্রভু, বন্ধুজননন্দী॥

কংসকোটি চরণে লুটে বাজালে তুমি বংশি
পাংশু মাঝে জাগায় প্রাণ সে তান শুভশংসি।
তাহে—সিংহ করী হিংসারত সখ্যে করে অংস নত,
বন্ধ হয়ে দ্বন্দ্বশত লভেগো চির সন্ধি।
চন্দ্রচূড়বন্দ্য প্রভু নন্দপুর-পুরনন্দী॥

বিম্বাধর-চুম্বরত কম্বুগ্রীবাভঙ্গে,
কান্ত ধ্রুব, শান্ত শুভ কান্তি তব অঙ্গে।
এই—বিশ্ব তব রঙ্গভূমি নিত্যনট বিহর তুমি
চল পদারবিন্দ চুমি নিখিল প্রেমগন্ধী।
সন্ধ্যামেঘ-সান্দ্রশ্যাম বৃন্দারকনন্দী॥

লুকোচুরি

তোর সনে ভাই লুকোচুরি-খেলা চলিতেছে মোর চিরকাল,
ধরে ফেলি তোরে যেমনই লুকাস শ্যামলাল।
লুকাস যেথায় সে ঠাঁই হরষে মশগুল,
গরবে গোপন করিতে সদাই করে ভুল,
আঁধারে লুকালে পায়ে-পায়ে ফুটে তারাফুল
ভিড়ে লুকাইলে বেজে উঠে খোল করতাল।
তোরে ধরা ভাই বড় সুবিধাই, তবু চলে খেলা-চিরকাল।

গগনে যখন লুকাস তখন দেখি যে স্বচ্ছ মেঘে-মেঘে,
হয় ঘন শ্যাম তোর তনুটির রঙ লেগে।
চিনি-চিনি বলে যদি দেরি হয়, তবে তায়
হাসিয়া ফেলিস রে চপল, তুই চপলায়।
মেঘের আড়ালে শিখি-চূড়া ঢাকা নাহি যায়,
ইন্দ্রধনুতে মাঝে-মাঝে তাই উঠে জেগে।
ধরা পড়ে গিয়ে চেঁচাস আবার বজ্রে গরজি রেগে-মেগে।

কাননে যখন লুকাস তখন সহজেই তোরে খুঁজে পাই ;
বৃন্দাবন যে স্মরিয়া সেদিকে আগে যাই।
বনমালী, তুই নূপুর না খুলি যাস ছুটে,
ঝিল্লির তানে বল্লীর প্রাণে বেজে উঠে,
অধর চরণ পরশে বাঁধুলী উঠে ফুটে—
কীচক-বনেও 'কু' দিয়ে লুকাস, রে কানাই।
ভারি তুই চোর, চপল কিশোর বারবারই মোরা জিতে যাই।

হ্রদের সলিলে ডুবিয়া ভাবিলি এইবার বুঝি যাব হারি।
জলে ডুব দেওয়া নূতন তোর কি দহচারী?
দেরি হলে তুই উঁকি দিস আধো আঁখি মেলি
ফোট-ফোট নীল কুমুদ-কলিতে ধরে ফেলি।
রাঙা পাণিদুটি বশ তো মানে না, করে কেলি,
জাগে যে মৃণালে কমল-কলিকা সারি-সারি,
ঢেউ-এর নাচন, নটবর তোর গোপন নটন-অনুকারী।

শেষে ঘরে-ঘরে হৃদয়ে-হৃদয়ে লুকাতে লাগিলি ননীচোরা,
গৃহকোণগুলি খুঁজিতে কি বাদ দিব মোরা?
প্রিয়ার প্রণয়ে প্রতিবিম্বিত তোর প্রীতি
সখার সখ্যে শুনি তোর দূর বেণু-গীতি,
চিনি যে শিশুর চারু-চাপল্যে নিতি-নিতি,
নিষেধ মানে না গোপন কথাটি কয় ওরা।
কায়া-তো লুকাস, ছায়াটি লুকাতে পারিস না যে রে ননীচোরা।

চির-শ্যাম

তুমি শ্যাম, তাই তোমার ধরণী এত শ্যামে-শ্যামে ভরা।
নয়নাভিরাম, তুমি তাই আঁখি জুড়ায় শ্যামল ধরা॥
বাজাইলে বাঁশি তাই কান দিয়া,
এই নিখিলের মরমে পশিয়া,
কূজনে গুঞ্জে কলতানে আজো মানবের মনোহরা।
ফাগে-ফাগে তুমি খেলেছিলে দোল,
ফাগুনের বনে তাই হিল্লোল,
বাগে-বাগে তাই অশোক পাটলে শোভা লালেলাল-করা।
গোকুলের হৃদি করিলে হরণ,
তাই দেহে-দেহে চুরি যায় মন,
তাই গেহে-গেহে ঐ পায়ে-পায়ে প্রেমের শিকলি পরা॥

চিরবন্দী

চিরবন্দী শ্যাম,
আজ কোথা গোষ্ঠযাত্রা কোথা ব্রজধাম?
ধরা দিলে একদিন মূঢ় গোপ গোপীগণ মাঝে,
বন্দী হলে বৃন্দাবনে মনচোরা ননীচোরা সাজে,
নির্লজ্জ কপট চৌর, বারবার একই অপরাধ?
সাধ করে দোষী সাজা, কহি তারে কেমনে প্রমাদ?
বলে চিত্ত-কারাগারে সেই হতে তুমি অবিরাম,
চিরবন্দী হয়ে আছ শ্যাম।

শতেক বাঁধন,
সেই হতে আর তব নাহি পলায়ন,
রাখালেরা ফুলহারে, গোপগণ উত্তরীয়-বাসে,
মা যশোদা উদুখলে, গোপীগণ বাহুবল্লীপাশে,
বাঁধিল শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জে-কুঞ্জে মাধবী লতায়,
বন্দী তুমি পত্রে-পুষ্পে জলে-স্থলে যথায়-তথায়।
চোখে-চোখে বুকে-বুকে আছ বাঁধা হে নন্দ-নন্দন
লভি বন্ধু শতেক বন্ধন।

চিরবন্ধু

ভাগ্যে তোমার নয়কো দেউল মস্ত ইমারত
যেথায় লোকের হুড়োহুড়ি ব্যস্ত সহরৎ,
তাইতো মোরা নৃত্য করি তোমার আঙিনায়,
যখন খুশি দুয়ার খুলে প্রণাম করি পায়
ছুটি পেলেই তোমার সাথে একলা ঘরে রই,
পরান খুলে চরণ তলে মনের কথা কই॥

ভাগ্যে তোমার নয়কো ভোগের মস্ত আয়োজন,
বইতে জিনিস হয় না হাজার লোকের প্রয়োজন।
তোমার অর্ঘ্য আহরণের বিষম উপদ্রবে,
প্রমাদ নাহি গণে দেশের দুঃখী লোকে সবে,
চাষের চালে, ঘরের দুধে, গাছের ফল-ফুলে,
যে দিন যাহা জুটে তাহা দেই গো পাদমূলে।
ভিন্ন করে আয়োজনের নাইকো দাবি দাওয়া,
এক থালেতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া।
তোমার গৃহে যেতে হলে পাণ্ডা প্রহরীকে
সাধতে না হয়, ঢুক্‌তে না হয় কায়দা-কানুন শিখে॥

ভাগ্যে তোমার রাগটিও নাই দেমাক্‌ অভিমান,
মোদের চেয়েও অল্প পেলেও তুষ্ট তোমার প্রাণ।
মারী ভয়ের দিনে তুমি ভাবো মোদের তরে
বর্ষাকালে মোদের সনে ভিজো ভাঙা ঘরে।
বন্যা দিনে উপোস কর আমাদেরি সাথে,
মোদের সাথে জেগে রহ উৎসবেরি রাতে।
মন্ত্র কোথা? যা খুশি তাই বলেই পূজা করি,
ভাগ্যে তুমি কাঙাল ঠাকুর কাঙালেরি হরি॥

দীনবন্ধু

রিক্ত আমরা—নিঃস্ব আমরা—কিছুই মোদের নাই
ঠাকুর মোদের কাঙাল তাইরে ঠাকুর কাঙাল তাই।
আমাদেরি লাগি হয়েছে ভিখারি
সেজেছে নাবিক, সেজেছে দুয়ারি,
কাঙালের বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছে বালিকার বেশে ছলি,
আমাদের নায়ে পার হয়ে পায়ে সোনা করে গেছে চলি।

মোদের ঠাকুর—সে যে আশুতোষ তুষ্ট ধুতূরা ফুলে,
ভস্মমুষ্টি দিলেও ঝুলিতে তাও হেসে লয় তুলে।
        চণ্ডালে সে যে দিয়াছে গো কোল,
        কিরাতের দলে হরি-হরি বোল—
মোদের জননী ফেলি হেম মণি হাতে নিয়েছিল শাঁখা,
ধূলিমাখা পায়ে বটতরু-ছায়ে তারি যে আলতা আঁকা।

কাঙাল সে যে গো বন্দী হয়েছে কাঙালের বাহুপাশে,
কাঙালে বক্ষে ধরিয়া সে যে রে চক্ষের জলে ভাসে।
        রাখালের দলে বাজাইল বেণু,
        চরাইল সে যে কাঙালের ধেনু
গোয়ালের ঘরে বহিল পশরা, ধরিল গোপীর পায়,
আমরা তাহারে যত চাই সে যে তার বেশি মোদে চায়।

উলুরবে তারে ডাকি গৃহমাঝে শোভি আলিপনা দাগে
ভিক্ষার চালে নৈবেদ্যও সুধাসম তার লাগে।
        কুবেরের দান জননী না চায়
        জবাফুল মোরা দেই তার পায়
জ্ঞানের ডঙ্কা কোথা পাবো, পূজি রামপ্রসাদের গানে—
সম্বল যাহা আমাদের তা যে দেবতা ভালই জানে।

বিদুরের ক্ষুদে, শামলীর দুধে, তার ক্ষুধাতৃষা হরি
সিনানের লাগি হৃদি-যমুনায় আঁখির কুম্ভ ভরি।
        শিখীর পালক চুলে দেই গুঁজি,
        তুলসী দূর্বা আমাদের পুঁজি,
কিবা দিব তারে বনমালা আর গুঞ্জার রাখি বই
বুঝিনা কোথায় খুঁজিব তাহায় বাহুতে বাঁধিয়া রই।

পুরাকথা

আজিকে বাহুপাশে রহিয়া রসরাজ মনে যে পড়ে বহুকথা,
কেমনে লুকাতাম কিশোরী হৃদয়ের গোপন স্বপনের—ব্যথা,
        সেটা কি আজ বঁধু, করিল বাঁশি তান
        কানের পথ দিয়ে মরমে আনচান,
তখনি করেছিনু এ নারী-হৃদি দান সে কথা বুঝনি কি প্রভু?
সে কথা বুঝাইতে এতেক আয়োজন ব্যর্থ হয় না তো কভু।

প্রভাত-প্রায়-শেষ নিশার হিমময় হৃদিটি কমলের কলি,
মরমে জাগিয়াছে গন্ধ মধুরস আসিতে বাকি শুধু অলি,
যমুনা উছলিলে হৃদয় উছলিত
নীপের সহ দেহ তখনি কাঁটা দিত,
আঁখি সে তখনিই গোপনে সুধা পিত চাপিয়া রহিতাম জাগি
তোমাকে লুকাবার ছিল না সাধ বঁধু, তোমাকে জানাবারি লাগি।

বুঝনি কি গো সখা যমুনাঘাট হতে ফিরিতে হত কেন দেরি ;
কেননা আসিতাম গোধন গোঠ হতে গৃহেতে ফিরিতে না হেরি
যমুনা তীরে যদি করিতে তুমি কেলি
কলসে সাধ করে দিতাম কেন ঠেলি?
সে শুধু তুমি দেখি সকল খেলা ফেলি সাঁতারি দিবে তুলি বলে,
কেন বা যেতে যেতে থমকি দাঁড়াতাম সখীরে ডাকিবার ছলে।

যূথীর শাখা হতে কুসুম তুলিবার শক্তি ছিলনাকো যেন
গোকুলে কেহ কিগো ছিল না ডাকিবার, তোমারে ডাকাতাম কেন?
তোমার পাশ দিয়ে যাইতে কেন মোর
বেতস ডালে শুধু বাধিত বাসডোর
বিঁধিত পথে যেতে চাহিলে তুমি, চোর, কুশের কাঁটা কেন পায়?
অভয় বাণী তব শুনাতে ধেনু যেন তুলিত শিঙ দুটি হায়!

বাঁশিটি শুনি তবে দিতাম দ্বারে সাঁজ তোমারি ধ্যান হতে জাগি
যে পথে তুমি তথা যেতাম শতবার নয়নে পড়িবার লাগি।
তোমারে হেরিতাম এমন ঠাঁয়ে স্বামী,
কেহ না দেখে মোরে দেখিতে পাই আমি,
আপনা সামলাই যদিও দিবা যামী সমুখে তবু আলু-থালু
তটিনী যত চাহে ঢাকিতে, বাহিরিত ততই সৈকত-বালু।

বুক সে ফেটে যায় মুখ তো ফুটেনাকো এমনি কিশোরীর প্রেম
যেন বা তস্কর সাধিছে দুষ্কর কুটিরে লুকাইয়া হেম.
দীর্ঘশ্বাস তাও শুনিতে পায় পাছে
ফেলিতে হেরিতাম কেহ কি আছে কাছে?
চাপিয়া রাখিবারে হৃদয় কাঁপিয়াছে, ফুঁপিয়া গুমরেছে প্রাণ
জীবন এইরূপে গোঁয়ানো কি কঠিন তুমিই কর অনুমান।

এসব কথা কি গো বুঝনি তুমি শ্যাম নিঠুর এত কি গো হবে
এত যে আয়োজন ছলের আবরণে লাজের আভরণে রবে?

জাগিত হৃদি কথা গণ্ড শোণিমায়
আঁখির ভাষা হতে বেশি কি বলা যায়?
ছিল না সংশয় কিশোরী অবলায় কেহ তা দেখিত না চাহি
যদি না বুঝে থাক তুমি গো তাহা, তবে রাখিতে দুখ ঠাঁই নাহি।

কুঞ্জ-ভঞ্জ

আর—নাহিকো রাতি, জাগে—কুসুমপাঁতি,
ঐ—প্রাচীর সিঁথির পরে সিঁদুরভাতি।
পাখি—কুলায়ে জাগে, দেয়—পালক নাড়া,
আঁখি—অরুণরাগে, তায়—জাগিল তারা
তারা—মধুর গাহে ঘুম—ভাঙাতে চাহে,
তারা—জাগায় জাগিয়া বনে সকল সাথী॥

ঐ—চক্রবাকী হের—চক্রবাকে।
নদী—পুলিনে থাকি এবে,—মিলিতে ডাকে॥
যত—কানন বালা, ধরে—ফুলের ডালা,
কিবা—নীহারমালা, আহা—শোভায় তাকে।
শুক—তারকাভূষা, সুখে—হাসিছে উষা,
ঐ—পিঙ্গলরূপ ধরে কুঞ্জ-বাতি॥

সাঁঝে—পদ্মকোষে মধু—হরণ ছলে,
অলি—আত্মদোষে অব—রুদ্ধ হলে।
ঐ—পদ্মকলি পুন—বক্ষ খোলে
এস—আলোকে অলি রেণু—গন্ধ মাখি।
জাগো—পিয়ারী মণি বাহু—বন্ধ হতে,
নীবি—বন্ধ, ধনি! বাঁধো—স্বপ্নপথে,
বাঁধো—কবরী ভাঙা অয়ি—রভসরতে।
মুছ—জাগর-রাঙা, দুটি—ডাগর আঁখি।
শেজ—চরণে লুটে সাজ—গিয়াছে টুটে,
পরো,—নব বনফুল মালা রেখেছি গাঁথি॥
আর—নাহিকো রাতি ফুটে—প্রসূনপাঁতি,
ঐ—প্রাচী দিক্‌বধূ ভালে সিঁদুরভাতি॥

ঋতুসংহার ও কুমারসম্ভব

মত করি করভকে ফুল্ল করি কুবককে
বসন্ত আসিল চারিদিকে
একপাত্রে মধুব্রত প্রিয়াসহ পানে রত
কানন ভরিল শুক-পিকে।
রুধিয়া ইন্দ্রিয়গণে উপবেশি যোগাসনে
মগ্ন তুমি কোন্ সাধনায়?
কর্ণে কর্ণিকার দুল গলে দুলে বনফুল
উমা তব অর্ঘ্য আনে পায়।

সহসা ভাঙিল তপ জ্বলে গেল দপ্-দপ্
অকস্মাৎ তৃতীয় নয়ন।
শুষ্ক পত্র মর-মর আসিল নিদাঘ খর,
ভস্মীভূত মকরকেতন।
বহ্নি-কুণ্ড-মধ্যগতা উমা তপস্যার রতা,
সূর্যপানে মেলি দুই আঁখি,
তরুপর্ণ হিমবারি তোমা লাগি তাও ছাড়ি
অস্থি-চর্ম আছে তার বাকি।

বরিষার বারি ঝরে জীর্ণ ধরণীর 'পরে
চাতকীর দীর্ণ কণ্ঠ-মাঝে,
তপঃশীর্ণা গিরিজারে তুমি এলে ছলিবারে
মেঘবক্ষে নব ছদ্ম সাজে।
জলভরা টলমল আঁখি তার ছল-ছল
পল্লবিত পুলক-অঙ্কুর।
শত গুণে কান্তি তার উপচিত পুনর্বার,
সর্ব দাহ-জ্বালা হল দূর।

আসিল শরৎ সিত আমোদিত আলোকিত
কৌমুদী-কুমুদী ফুল্লকাশে,

শুভ্র কৈলাসের 'পরে লীলা-শতদল করে,
গৌরী আজি হাসে তব পাশে।
সুরভি লহরী ঠেলি অবিশ্রান্ত জলকেলি,
রচে মীন মেখলা সুন্দর,
মরকত-শিলা-মাঝে উমার নূপুর বাজে,
সিংহ পায়ে দুলায় কেশর।

হেমন্ত আসিল ধীরে, মধুর সঙ্কোচ ঘিরে
শেফালির আরক্ত বয়ানে,
পাণ্ডুর বদনখানি তুলিয়া তোমার রানী
চাহে নর্ম-বিমুখ নয়ানে,
শস্য-গর্ভা শালিসমা অন্নপূর্ণা মনোরমা,
দোহন-লক্ষণ সারা গায়,
পল্লবিনী অঙ্গলতা পীন শ্রোণি-ভারানতা
আকম্পিতা লজ্জায়-কুণ্ঠায়।

শীত এল পথে-ঘাটে স্বর্ণ-শস্য মাঠে-মাঠে
শঙ্খ বাজে উটজ-প্রাঙ্গণে।
লাজবর্ষ গেহে-গেহে, নব হর্ষ দেহে-দেহে
রোমাঞ্চ ফুটায় ক্ষণে-ক্ষণে।
হলুদ-কাজল-মাখা দুকুলেতে আধো ঢাকা
কুমারে সে কোলটি উজল,
উমা হাসে তব পাশে, তোমার নয়নে ভাসে,
শিশিরাশ্রু আনন্দে উচ্ছল।

ঝুলন

শাখিশাখে রচিয়াছি ঝুলনা
শাওনে মধুর সাঁঝ, এসো এসো রসরাজ,
শুভ অবসর আজ, ভুলোনা॥

নদী-পারাবার দুলে কূলে-কূলে উছলি,
দামিনী ঝলকি দুলে দিকে-দিকে উছলি,
কোটি-কোটি বারিধারা ডোরে বাঁধা গ্রহতারা,
হল আজি সারা ধরা দোলনা।
দোদুল যামিনী আজ, ভুলো না॥

শাখি-শিরে শিখী দুলে মেলি চারু পাখাটি,
হেলে-দুলে যূথীলতা চুমে নীপশাখাটি,
ঘুরে অলি ফুলে-ফুলে ঝুলে-ঝুলে, দুলে-দুলে,
এ লীলায় কোথা মিলে ভুলো না?
এ ঝুলন-মিলনেরে ভুলো না।

রাকা-শশী ছিল বসি মসী-মেঘাবরণে
যমুনালহরে দুলে বাধা-অপসরণে।
দোলো তুমি তারি মতো রাধা সনে অবিরত,
চুমা খেয়ে করি শত ছলনা,
আজিকার শুভখন ভুলো না॥

দেহে-দেহে প্রাণ দুলে হিয়া হৃদে ধরিয়া
ক্ষণে-ক্ষণে গূঢ় কোণে আনাগোনা করিয়া,
টলে যতি ধ্যান-পথে, টলে রথী রথে-রথে,
টলে আজি কুল হতে ললনা।
আজিকার নিশি শ্যাম ভুলো না॥

চূত-মঞ্জরী

আম্র-মুকুল ছন্দোদোদুল গন্ধে মৃদুল মিঠে,
বনের তূণীর ছাপিয়ে জাগিস রতিপতির পিঠে।
রূপ ছেড়ে কোন্ তৃষ্ণা লয়ে তীক্ষ্ণ কুহুঃশব্দ হয়ে,
আসিস ছুটে বিঁধিস মোদের প্রাণের গিঁঠে-গিঁঠে।

আম্র-মুকুল অমৃত-ফুল মদির রসের ঝোরা,
বন-বালাদের হাজার হাতে পিচকারি কি তোরা?
রাখিস বাগান রঙিন করে তুলিস কূজন গগন ভরে,
তোদের দোলে মনে-প্রাণে রঙিন হলাম মোরা।

রঙের মশাল, মুকুল রসাল, আছিস রসে ফুলি,
মাধবিকার আঙুলে সব আতস-রঙিল তুলি।
নানান রঙের চিত্র এঁকে দিলি বনের শ্যামল ঢেকে।
গগন-পটে আঁকবি বুঝি বনের স্বপনগুলি?

রসাল-মুকুল, সংগীতাকুল ফুলন্ত মঙ্গল,
কাষায় দুকুল-জয়কেতু তুই দিগন্তে উজ্জ্বল।

ভ্রমর-পাঁতির আঁখর লেখা জয়-গাথা তায় যাচ্ছে দেখা,
নবৎ বাজায় তাহার তলে বৈতালিকের দল।

রসাল-মুকুল, রসরাজের পূজার আয়োজন,
ধূপশলা—নৈবেদ্য—মধুপর্ক—নিবেদন।
ভোগ-আরতির বাদ্যঘটা হোমানলের শিখার ছটা,
বোধন-কলস অর্ঘ্য-বিলাস সবার সম্মিলন।

ভাদরে

বঁধু—আজিকে মধুর ভরা ভাদরে,
ঝরে নভে নীরধারা ঘরে ঘরে ক্ষীরধারা,
দাদুরী মুখরা হল আদরে॥
ছুটে ধারা টুটে কারা গিরিদরী বিদারি,
হৃদ-সরোবর নব সরসিজে শ্রীধারী,
নাহি অবসর আজ কোন লাজদ্বিধারই,
মিছে নিষেধের বাঁধ বাঁধো রে।
মীন-বিনিময় করে আজি বক-বকীরা,
নিশীথেও মিলে আজি যত চখা-চখীরা,
তীরে-নীরে কলরব করে সখা-সখীরা,
নবীন মাধুরী দয়িতাধরে॥
বুকে ব্যথা পুষি বৃথা মিলনের প্রয়াসে,
কোন্ শাপে কোন্ পাপে, বঁধু, তুমি প্রবাসে?
সকল বাঁধন ছিঁড়ে ফিরে এসো স্ব-বাসে,
মিছে কেন মেঘদূতে সাধো রে॥
যূথহীন হয়ে মীন ঘুরেনাকো সরসে,
ফুলবধূ হেসে মধু ঢালে অলি-পরশে।
গিরি-উরসিজ আধো ঢাকি লাজে-হরষে,
এ ধরা মাধুরীভরা বাদরে॥

ঋতুলক্ষ্মী

নিদাঘে তোমার রুদ্রাণীরূপ, ইন্দ্রাণী বরষায়,
শরতে শুভ্রা বাগ্‌দেবী তুমি, ভাস্বর তব কায়।
শ্যাম হেমন্তে কল্যাণী রমা, অন্নপূর্ণা শীতে,
প্রেম-বসন্তে ফুলধনু রচ রতিরূপে অটবীতে।
এক চোখে হাসি, আর চোখে ধারা, মেঘে-রচা তব বেণী,
অশেষ শ্যামল বাসবিস্তারে শ্যামলা যাজ্ঞসেনী।
"পদাঘাত তব, শুষ্কশাখায় অশোকের বিকাশক,
সীধু-গণ্ডুষে বকুল বিলসে, আশ্লেষে কুরুবক।
পরশে তোমার ফুটে প্রিয়ঙ্গু, মন্দার মধুভাষে,
বদনমারুতে চূতমঞ্জরী, চম্পক মৃদু হাসে ;
সংগীতরসে নমেরু বিকসে—নটনে কর্ণিকার,
তিলক কুসুম পুলকে শিহরে—দৃষ্টির উপহার
হস্তে তোমার লীলারবিন্দ, কুন্দ অলক 'পরে
লোধ্র-পরাগে গণ্ড তোমার পাণ্ডুর শোভা ধরে,
চূড়াপাশে তব নব কুরুবক, শ্রবণে শিরীষ-দুল,
চারু সীমন্তে পুলকাঞ্চিত শোভে কদম্ব ফুল।"
ষট্‌পদরুত ষড়্‌রাগে তব লীলাহিন্দোলা দোলে,
মৃত্তিকা 'পরে কৃত্তিকা তুমি যড়ানন তব কোলে।

চন্দন-ঘষার গান

দুয়ার খোল-গো দুয়ার খোল-গো চন্দনবনসুন্দরী।
এনেছি পুষ্প শ্রীফলপত্র সন্ধান করি বন ভরি।
শুন ঘনঘন ওই শাঁখ বাজে এখনো যে সতি রত গৃহকাজে?
পরিতেছ বুঝি কৌষেয়-শাটী গঙ্গার জলে স্নান করি?
গন্ধতৈলে দীপখানি জ্বালি ধূপদানে ধুনা-গুগ্‌গুলু ঢালি,
আনো মৃগমদ পুষ্পের ডালি দূর্বা-তুলসী-মঞ্জরী॥
তোমার কঠিন কাঠের দুয়ারে শোন, করাঘাত করি বারেবারে
পূজার বেলা যে বয়ে যায়-যায়, রুষ্ট হে হবে শঙ্করী॥

কালোরূপ

ভোমরা, তোরে কুরূপ বলে? হলেই বা তুই কালো।
তোর রূপে যে বনরমার শ্রীমন্দির ঐ আলো।
সুন্দরের বন্দনার তরে কুঞ্জবনে কে গুঞ্জরে?
তোর সুষমার যোগ্য আদর কুসুম-বধূই জানে।
রসোৎসবের তুই দেবতা, সে কি শুধু কথার কথা?
সুষমা তোর মূর্তিতে নয় মূর্ছিত হয় তানে।
হলিই বা তুই কালো—
অনিন্দ্য তুই, সুন্দরে তুই বাসিস্‌ যে রে ভালো।

ও কালো মেঘ, লোচন-রুচির, যদিও তুই কালো।
বুক চিরে—তুই ফুটাস চিরসুন্দরেরই আলো।
ইন্দ্রধনুর স্বপন দেখিস, চন্দ্ররেণু গায়ে মাখিস,
অধীর শিখী নাচে যে তোর মেদুর পরশনে ;
যক্ষযুবার বার্তা বহি সুন্দরীরে আশিস কহি
অধরে তোর সুধার ধারা বর্ষণে—আর স্বনে।
হলিই বা তুই কালো—
সুরাঙ্গনা অঙ্গনে তোর সুবর্ণ ছড়ালো।

ওরে গভীর দীঘল দিঘি, হলিই বা তুই কালো,
তোর রূপে যে উঠল ব্যেপে সবার রূপের আলো।
রূপের মোহে মরাল ছুটে, রূপ ছড়ায়ে কমল ফুটে,
সোম-তপনের প্রেম-স্বপনে উজল তনুখানি।
রূপসীরা স্নানের ছলে নোয়ায় মাথা চরণতলে,
তোর মুকুরে মুখ দেখে কি রূপনগরের রানী?
হলিই বা তুই কালো—
বনশ্রী তোর আলিঙ্গনে বরাঙ্গ জুড়ালো।

ওরে আঁখি কাজলবরন, যদিও তুই কালো,
তোর বিহনে গভীর আঁধার বহ্নি-রবির আলো।
সুন্দরের এ সৃষ্টি শোভন তুই করেছিস দৃষ্টিলোভন,
চাঁদ তারকা মাগে জীবন তোর তারকার কাছে।
তুই অনিমিখ, রূপের পানে মুদেও থাকিস্ রূপ-ধেয়ানে
রসাঞ্জনে ভূষিয়া দীপ তোর পরসাদ যাচে।
হলিই বা তুই কালো—
শিল্পীরা সব কটাক্ষে তোর কল্পনা ছুটালো।

পতিতা

তোরা যা-লো সবে বাহিয়া তরণী,—গাহিয়া গান,
আমি রই এই ঘাটে,
দেখি হেথা সতী-বধূর সুখের মধুর প্রাণ
পল্লীর নদী-বাটে।
এই গাঁয়ে আসি পরি পরিণয়-সিঁদুরটিপ,
শুভ সন্ধ্যায় জ্বেলেছিনু দেবদেউলে দীপ।
আঙিনা ভরিয়া শিশু-দেবরের সে কলতান,
স্মরিতে হৃদয় ফাটে—
তারা যা-লো সই বাইয়া তরণী, গাইয়া গান,
আমি রই এই ঘাটে।

বারো মাসে তেরো ব্রত পার্বণ মহোৎসবে
রচেছি পূজার থালা,
মঙ্গল-কাজে এয়োদের মাঝে হুলুর রবে
ধরেছি বরণ ডালা।

ঐ পথে নিতি বহিতাম কত কলসি জল,
সিক্ত রহিত মোরি করে গৃহ-তুলসীতল।
দিবাশ্রমজল নিশার সোহাগে হইত মধু—
অলকে দুলাত মোতি,
লোক-মুখে-মুখে রাক্ষসী, হল লক্ষ্মী বধূ,—
সাক্ষাৎ ভগবতী!

ঐ যায় যেবা, আড়াল পড়িল অড়র বনে
যার শ্যাম তনুলতা,
নব কৈশোরে পাতান সই সে, তাহার সনে
হইত মনের কথা।
স্নান করি ফিরি সুধা দিবে মরি সবার পাতে,
ঝক্‌মক্ লোহা শাঁখা চুড়ি আহা, উহার হাতে,
তক-তক করে পতি-বৈভবে ভবনতল,
সতী-গৌরবে ফিরে,
চুমিবে খোকারে, মুছিবে লোকের চোখের জল
লভিবে আশিস শিরে॥

বাগদির মেয়ে ডাক দিয়ে ফিরে ছাগল হাঁসে
জালি কাঁধে হাসি মুখে,
মণি বাঁধে ওযে কাদামাখা ছেঁড়া শাড়ির ফাঁসে,
ও-ও আছে কত সুখে।
শিশু কলরোলে গৃহভরা পশুপক্ষীদলে
লক্ষ্মী-জননী ঘুরিতেছে যেন করুণা ছলে,
পতি পায়ে শেষে মাথা রেখে আহা মুদে'গো চোখ
যদি এ সধবা সতী—
ওর পদধুলি শিরে নিবে তুলি দেশের লোক ;
মরি রে ভাগ্যবতী!

বালিকার ব্রতে রচি দেবতার অর্ঘ্য-ডালি
ঢালিনু পিশাচ পায়।
লভিলাম প্রেমজীবনের হেমপ্রদীপ জ্বালি
ধোঁয়া আর কালিমায়।
নিঝর তেয়াগি পিইনু মাঠের পঙ্ক-বারি,
উল্কার পিছে ধাইলাম ধ্রুবতারকা ছাড়ি।
গেল শুভধ্রুব এক পলকের মোহন ভুলে,—
ইহকাল—পরকাল!

পিশাচ-শ্মশানে নিয়ে এল বৈতরণী কূলে
মারীচের মায়াজাল।

মুক্তা ফলিতে পারিত এ তনু-শুক্তি ভরি
স্বাতীর পুণ্য জলে,
হইতে পারিত মম লাবণ্য-শ্রীমঞ্জরী
পরিণত মধু ফলে।
মহারানী হয়ে মম সংসার-সিংহাসনে
শাসিতে তুষিতে পারিতাম নিতি আপনজনে।
উঠিতে পারিত মম যৌবন-সিন্ধুনীরে
বৎসলতার সুধা,
হরিতে পারিত মাতৃজীবন, স্তন্য-ক্ষীরে
পিতৃ-লোকের ক্ষুধা।

শত্রুরও যেন হয়নাকো হেন অশুভ ক্ষণ,
কর এ বিধান দান,
হেয়জন-পেয় সুরার শুল্কে, গোরসধন
বেচেনাকো, ভগবান!
দাও শ্বাশুড়ির লাঞ্ছনা শত, মলিন বেশ,
ননদীর গালি, আধপেটা ভাত, রুক্ষ কেশ,
উদয়-অস্ত দাও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম,—
ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই।
ফিরে নিতে রাজি সংসারপথ সুদুর্গম
ফিরে যদি আজি পাই।

সবি শেষ হোথা ঐ জ্বলে চিতা নদীর তীরে
শেষ সব আয়োজন।
হোথা প্রিয়জনে দহিয়া ভাসায়ে নয়ন-নীরে
ফিরিতেছে কত জন।
এ মুখে আগুনো দিবে না, হায় কি পাপের ফল।
অশৌচ পালিয়া সঁপিবে না কেহ পিণ্ডজল,
নূতন করিয়া এই পোড়া মুখে আগুনই কেন?
চির চিতা জ্বলে বুকে!
পড়িবে ললিত লালসা, লালিত তনুটি হেন
কুকুর শৃগাল মুখে।

তোরা যা-লো ফিরে বাইয়া তরণী, গাইয়া গান
নগরের রূপহাটে।

দিনে দশবার বেয়ে মর দেহতরণীখান
নরকের পার ঘাটে।
হারাতে আমায় কেন এলি হায় সোনার গাঁয়,
মধুযৌবন যাপিনু যেথায় সোহাগছায়?
জীবনের জ্বালা আজিকে জুড়াতে মরিতে চাই
ডুবে এই নদী-নীরে।
রসাতলে আছি নদীতল দিয়ে নরকে যাই
তোরা যা লো সখী ফিরে।

প্রিয়ার চিঠি

হাতের লেখা নেহাৎ কাঁচা লাইন হরফ নয়কো সোজা,
কতক-কতক যাচ্ছে পড়া কতকগুলো যায়না বোঝা।
বানান-ভুলে,—নানান ভুলে—ব্যাকরণের-শ্রাদ্ধ করা,
এলোমেলো আবল-তাবল অনেক বাজে কথায় ভরা।
কোন্‌খানে বা লিখতে গিয়ে লেখেনিকো লজ্জাভরে,
লিখে আবার কেটে দেছে,—সেটাই বেশি চক্ষে পড়ে।
তবু এ মোর মনের মতন, হিয়ার রতন, প্রিয়ার চিঠি,
তাহার কালো তরুণ আঁখির এ যে হাজার করুণ দিঠি।

চতুরতার আমিষ নাহি প্রিয়ার আতপ অন্নকূটে
মোমের কুসুম নয়তো, এ যে বনের কুসুম পত্রপুটে:
ভাষার ক্ষতিপূরণ এতে ভালোবাসার গভীরতায়
প্রতি আঁখর মুখর হয়ে বল্‌ছে মোরে কত কথাই।
এ শুধু তার নয়কো চিঠি—আমি তো তার হৃদয় জানি,
আলোছায়ায় কালো-সাদায় এ তার হিয়ার ছবিখানি।
সেই আঙুলের পরশ লভি সেই অলকের গন্ধবায়ে
প্রিয়ার আমার অনেকখানি জড়িয়ে আছে চিঠির গায়ে।

কোথায় পাব সাজান ফুল! এ যে আমার শিউলিতলা।
এলোমেলো আল্‌পনা এ,—নাইকো এতে শিল্পকলা।
হার ছিঁড়ে এ মুক্তাগুলো ছড়ান যে পথের 'পরে,
হারাবেনা একটিও এর পথিক-প্রাণনাথের করে।
ছিন্নমেঘের ভানুর কিরণ,—ইন্দ্রধনু বক্ষে আঁকে,
হিয়ার অমল নীলিমা তার দেখছি রেখার ফাঁকে-ফাঁকে।
এ যে আমার প্রিয়ার লিপি তাহার হিয়ার রক্তে লেখা,
মসীর নিকষ-উঁপল পরে প্রেমের উজল কনকরেখা।

মঙ্গল-চণ্ডী

"ওগো গৃহস্থ,—মাতা মঙ্গলচণ্ডী এসেছে দ্বারে,
পূজা দাও ওগো—চির শুভ হবে তোমাদের সংসারে।"
সিন্দুর মাখা—পুত্তলিকায় ঝুলাইয়া ঐ বাঁকে
কাঁসি বাজাইয়া, দেখ দেখ, আহা দ্বারে-দ্বারে কেবা হাঁকে।
দুই মুঠা চাল দুইটি সুপারি দাও দাও ডেকে ওরে
ওর ডাকে প্রাণ চমকিয়া উঠে থম্‌কি কেমন করে?
কাঁশির আওয়াজে কার গলা যেন সকরুণসুরে বাজে,
বুঝি— সিন্দুর ছদ্মে দোলায় ছলনাময়ী মা রাজে।

বঞ্চক বলি দূর করি ওরে—করিওনা বঞ্চিত,
হীন যাএারে ধর্ম্মের নামে করেছে সে উন্নীত।
দেবতারে তুমি কর যে ভক্তি, কৃপা কর অভাগায়,
এ খ্যাতি তোমার অক্ষয় হোক ক্ষুণ্ণ করোনা তায়।
করনা বিচার দেবতার নামে দুই মুঠা তুলে দিতে
ঠিক ঠিকানায় পৌছিবে, যাবে জননীর বেদীটিতে।
একলা আসিলে পাছে তুমি তারে পথে দাও দূর করি
আসিয়াছে তাই ভিক্ষা মাগিতে মায়ের আঁচল ধরি।

দীন দুলালের কর ধরি দেবী অতিথি তোমার দ্বারে,
কাঙালে তাড়ায়ে ভ্রম ক্রমে তুমি তাড়ায়ে দিওনা তাঁরে।
ওগো চণ্ডীর সুখীসন্তান!—তব ভাণ্ডার ঘরে
অনেক ছেলের গ্রাসাচ্ছাদন গচ্ছিত থরে—থরে।
যত কর ব্যয় তার মাঝে জেন, সব হতে খাঁটি তাই
যে দুটি মুঠায় প্রাণে বেঁচে যায় ফকির ভিখারি-ভাই।
বারি ধন তুমি তারে কর দান,—তবু হয় লাভ ধ্রুব,
—তনয়-কণ্ঠে মায়ের আশিস বণ্টন করে শুভ।—

প্রদীপের পুনর্জন্ম

আবার মোদের আঁধার আগারে প্রদীপ জ্বলেছে আজ,
আজিকে প্রেয়সি, ঘুচেছে কুণ্ঠা প্রণয়লীলার লাজ।
ঘরের প্রদীপ নয়ন মেলিলে মুদিয়া রহিতে আঁখি,
সঙ্কোচে,—মুখ-পঙ্কজ তব অঞ্চল দিয়ে ঢাকি।

পরিহাস-পটু চটুল নিলাজে নিভালাম মুখবায়
কুসুম-শয়ন-রজনী হইতে নিভিয়া রহিল হায়।
নির্বাণ পেলে জন্ম হয় না, এ-কথা কে-আর শোনে?
আবার বর্তী লভেছে জনম জ্বলিছে এ গৃহকোণে।

মোদের দোঁহার হৃদয় পাবকে কনক প্রদীপ জ্বলে,
তোমার অঙ্কবেদিকায় তব হৃদি-স্নেহ তার গলে।
সোনার প্রদীপ জ্বলেছে বলিয়া মাটির প্রদীপও তাই
সারারাতি জ্বলে, দহে পলে-পলে, আজি বিশ্রাম নাই।

বাছনির লাগি আজিকে তাহার বাড়িয়াছে সমাদর,
কখন জাগিবে উঠিবে সে কেঁদে কখন পাইবে ডর।
সচেতন ঘুম, জাগো দশবার, রাতে বাড়িয়াছে কাজ,
বহুদিন পরে আবার এ ঘরে প্রদীপ জ্বলেছে আজ।

শেষ

দিনটি হইল শেষ। রবি গেল পাটে
পাঠশালে পাঠ শেষ ছুটি সবাকার
মাঠে শেষ সেঁচা কোঁড়া, বেচাকেনা হাটে
তটে শেষ তটিনীর খেয়া পারাপার।
ঘাটে শেষ ঘট ভরা কাঁকনের তান,
গোঠে শেষ গোধনের দিনান্ত ভোজন,
বট বিম্বে শেষ বনবিহগের গান
বাটে শেষ হাটুরের ব্যস্ত বিচরণ।
ফোটা শেষ মালতীর বনে উপবনে
মঠে শেষ আরতির নিক্কন মধুর
ঝাঁটে পাটে গৃহকাজ কুটির প্রাঙ্গণে
হাঁটা শেষ করি পান্থ করে ক্লান্তি দূর।
এই সর্ব শেষ মাঝে উদাস সন্ধ্যায়
জীবনের-শেষ, সেও উঁকি দিয়ে যায়।

কুন্দকুড়া
১৯২২

বঙ্গভূমি

(গান)

নমি শ্যামা মৃগাজিন-বসনা।
কুজন-গুঞ্জ-কল-ভাষণা।
মঠে-মঠে পূজা তব   তটে-তটে বৈভব
দেশে-দেশে তব যশোঘোষণা॥

ঘনবট-সুশীলতা, নবঘন-কুন্তলা,
সরসিজ-বিলোচনা, স্ফুট-নীপ-কুণ্ডলা,
উশীরানুচর্চিতা   ধূপদীপে অর্চিতা—
কুন্দকোরক-রুচি-দশনা॥

স্নেহ তব খনিভরা, তনুভরা বনভূষা ;
শ্রিতফণি-মণিমালা, ধৃতহেম-মঞ্জুষা ;
গিরি-বন্ধুরদেহা   বেতস-কুঞ্জগেহা,
বিরচিত-মীনযূথ-রশনা॥

হ্রদনদগদ্‌গদ-মধুনাদবন্দিতা,
চমরীবীজিতকায়া মৃগমদগন্ধিতা,
সিন্ধুদোলনধৃতা,   সুরধুনী-ধারাপূতা,
তুষার-সুশীত-সিতহসনা।।

রেবা-রোধসি

(রেবাতটের স্মৃতি)

মন পড়ে আছে রেবাতটভূমে বেতসকুঞ্জতলে,
যেথা তব দেখা পেতাম চকিত কৈশোর-কুতূহলে।
হেথায় পৌর সৌধ-সদনে   তোমার নিবিড় বাহুর বাঁধনে,
সেই স্মৃতি আজো অন্তরে ঘুরে সন্তরি আঁখিজলে॥

সেই লুকোচুরি গোপনাভিসার সেই দুরু-দুরু বুক,
এলা-গন্ধিত নিভৃত আঁধারে চকিত মিলনসুখ,
সে সুখের তুলা নাহি এ জীবনে   সে সুখ-বিরহ আজি এ মিলনে
ধিকি-ধিকি জ্বলে, তোমার বিলাস-জতুগৃহ তায় গলে॥

নূপুর খুলিয়া নীলবাসে সেই ক্ষতপদে আসাযাওয়া,
বন-মরমরে চমকি-চমকি ঠায় আশাপথ চাওয়া,
বিদায়ের ক্ষণে হৃদয় বিবশ   আঁখিজলে লোনা চুম্বনরস,
এমনি কতই মনে আসে নবমালতীর পরিমলে॥

আছে বা কেমন আহা রেবাতটে সেই তরুলতাগুলি!
হয়তো তাহারা নব অনুরাগে আমাদেরে গেছে ভুলি।
জানে না হেথায় সোনার পিঁজরে   বনের পাখিরা ছটফট করে,
পল্লবছায় গোপন-কুলায় স্মরিতেছে পলে-পলে॥

ইউসুফের প্রতি জুলেখা

(জামি)

দেবতা, তোমায় দেছেন বিধাতা গুলভাতি তব কপোলে ফুটে,
রূপ-চঞ্চল দুনিয়া পাগল, হের তব পদ যুগলে লুটে।
ও ললাট-তটে যে দ্যুতি প্রকটে চন্দ্রমা তায় পাণ্ডু ম্লান,
তব অপাঙ্গে চারু ভ্রূভঙ্গে পেল অনঙ্গ ধনুর্বাণ।
তোমার তনুর বসনে ভূষণে শুভ সুষমার আলোক লাগে,
লোহিত সুসিত কুসুম অযুত ফুটে যেন তায় দ্যুলোক বাগে।
মধুর অধরে মদির হাসিটি চারু কোরকের বিকাশসম
গুলের পাপড়ি-ঝরার মতন তব পদক্ষেপ মানস-রম।
তুমি আছ বলি সর্বংসহা সব গুরুভার বহিতে পারে,
তোমারে হারালে সে বুঝি পাতালে অতলে ডুবিবে ভূধর-ভারে

তুলে ধর মোরে, ডাকি করজোড়ে শরণ-বন্ধু, করুণা কর
শুন এ কাকুতি প্রাণের আকুতি ব্যথা হর মোর শোচনা হর।
তপ্ত শ্বসনে বহ্নি-শোষণে চপল অশ্রু উপল যায়।
অশনি-আহত অশথের মতো অন্তর মোর বিদরি যায়।
প্রলেপ স্নিগ্ধ করি নিদিগ্ধ ভুলাও দগ্ধ হৃদির জ্বালা,
দুলাও বন্ধু দুলাও কণ্ঠে তোমার বাহুর নিধির মালা।

নিরাশা-তপন দহেছে স্বপন, হয়েছে জীবন সাহারা যেন,
খোসবাগানের খোসবো এমন বহাইলে তায় আহারে কেন?
বহাইলে যদি, ঝলসিত হৃদি-কুটিরলে ঢালো সোমের সুধা,
চির-অনশন-ক্লিষ্ট জীবন, মিটাও মোহন, প্রেমের ক্ষুধা।

প্রেমের তত্ত্ব

(Shelly)

ঝরনা মিশিছে তটিনীর সাথে তটিনী মিশিছে বারিধি সনে,
সমীরের সাথে সমীর মিশিছে প্রাণের আবেগে তারকা বনে।
এ নিখিলে কেহ নাহিতো একেলা বিধির এমন বিধান ধ্রুব?
সবাই মিলিছে, তব সাথে মোরি কেন নাহি হবে মিলন শুভ?
হের নগরাজ চুমিছে গগন চুমোচুমি করে লহরী গুলি
প্রকৃতি জননী ক্ষমে না যদি বা ফুলে ফুল চুমে না পড়ে ঢুলি।
সিন্ধুরে চুমে ইন্দুজোছ্না রবিকর চুমে শ্যামলা ভূমি,
এত যে চুমায় কিবা আসে যায় মোরে চুমা যদি না দাও তুমি?

মিলোনোৎকণ্ঠিতা

চুলগুলো সই অমন করে বাঁধিস না আজ টেনে
অমন খোঁপা বাসে না সে ভালো,
গঙ্গাজলী ডুরে খানা দে—না পুটি এনে
মানায় কি আজ দেহে বসন কালো?
নখের পরে আলতার টিপ দিস্না পায়ে ধরি
পরতে যেন করেছিল মানা
কাঁচপোকাটিপ কাজ নেই বোন সিঁদুরটিপই পরি
কি চায় সে যে আমার আছে জানা।

বছর ধরে নাইকো দেখা হুঁস হল তার আজি,
হা সই আজি কখন হবে সাঁজ?
ছ-মাস হতে গুণছি যে দিন দেখছি শুধু পাঁজি,
মুখ তুলে কি চাবেন হরি আজ?

ছ-মাস হতে যাচ্ছি যাবো, আচ্ছা নিঠুর স্বামী
বল্‌ তো লো-বোন কিসে জীবন ধরি?
যতক্ষণ না দু-চোখ মেলি দেখছি তারে আমি
ততক্ষণ তার ভরসা কি আর করি?

প্রাণে কত ধুক্‌—পুকুনি,—কত যে সংশয়
দেখে কি আর প্রাণটা কভু খুঁজে?
দগ্‌দগি এ হিয়ার ভিতর নিত্য নূতন ভয়
পুরুষমানুষ ভাবে কি আর বুঝে?
যাক্‌গে সে সব বুঝাব তায় আজকে নয়ন জলে
নারীবধের পাপীরে বোন পেয়ে,
মুখখানি আজ সারারাতি রেখে চরণ তলে
তুলবো না আর, দেখবনাকো চেয়ে।

নইলে দিদি বলিস্‌ যদি কইব না তায় কথা
পিছু ফিরে মুখ ফিরায়ে রবো,
বে-দরদী,—বুঝে না যে অভাগিনীর ব্যথা
তার কাছে বোন নরম কেন হব?
বলছি বটে তেমনি করে কেমন করে রই
আসছে সে যে বছরখানেক পরে,
দূর প্রবাসে হয়তো বড় কষ্টে ছিল সই,
একবারে সে যদিই গলা ধরে?

বলছি যে সব হয়তো কিছুই হবেইনাকো কাজে,
কেমন যেন লজ্জা করে বড়,
অনেক দিনই হয়নি দেখা, হয়তো আবার লাজে
হবো নতুন বউটি জড়সড়।
হয়তো অনেক রোগে ভুগে শরীরখানা ক্ষীণ,
ছুটি আগে পায়নি কোন মতে,
অনাহারে হয়তো আহা আসছে সারাদিন
হয়তো অনেক কষ্ট পেয়ে পথে।

আজকে আমার মাথায় যেন ঘুরছে হাজার জাঁতা,
প্রাণে বলক উঠছে এমন কেন?
শোন্‌ না কেমন বুকের কাছে আন্‌না সখি মাথা
ঢেঁকির মুষল পড়ছে বুকে যেন।

হাত-পা কাঁপে চল্‌তে গিয়ে পড়ছি কেবল টলে
রকম দেখে নিজেই মরি লাজে,
আয় ননদি মাথা আমার রাখিলো তোর কোলে,
পায়ে ধরি ডাকিস না আজ কাজে।

হাজার-হাজার নৌকো যে আজ ভিড়ে মনের তটে
কানের ভিতর হাজার-হাজার গাড়ি,
প্রতি পায়ের শব্দে কেমন ভ্রান্তি কেবল ঘটে
মা বলে অই এলোই বুঝি বাড়ি।
হাসিস না বোন দাঁড়া আগে আসুকই সে ফিরে
আর কি শুধু আসার আশায় ভুলি,
হাসিস এখন দেখিস যেন আমার নয়ন নীরে
নাহি তিতে তোদের আঁচলগুলি।

বঞ্চিত

কেন—বঞ্চিত হব ভোজনে?
মোরা—কত আশা করে নিজ বাসা ছেড়ে
খেতে—এসেছি এখানে কজনে।
ওগো—তাই যদি নাহি হবে গো,
এত কি গরজ তোমার বাড়িতে
ছুটিয়া এসেছি কবে গো?
হয়ে—ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ,
এসে—দেখিব কি খাওয়া বন্ধ?
তবে—তাড়াতাড়ি 'পাত করো বলে ডাকো
তব আত্মীয়-স্বজনে॥

মোরা—শুনেছি তোমার বাড়ি,
চাহে যদি কেউ একহাতা কিছু
এনে দেয় হাঁড়ি-হাঁড়ি।
তুমি—পাবনা হইতে দধি ভাঁড়-ভাঁড়
গয়া হতে প্যাড়া এনেছ দেদার,
একি—সবি মিছে কথা? দিওনাক ব্যথা
মোরা—খাবনা তো বেশি ওজনে॥*

ঘৃতং পিবেৎ

'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,' ঋণ করেও ঘি খাওয়া চাই,
চার্বাকের ঐ চর্বি-তন্ত্র লিখে গেছে ঠিক কথাটাই।
এ ঋণ কিছু শুধ্‌তে না হয়, ঘৃতে যে হয় বল উপচয়,
(তাই) ঘৃতভুকে চাইতে টাকা পাওনাদারের সাধ্য কি ভাই?

রজনীকান্তের একটি গানের প্যারডি।

ঋণ কেন কই?—ঘৃতননী চুরি করাও চলতে পারে,
সাক্ষ্য ইহার মানতে পারি বৃন্দাবনের পুরাণকারে।
না হরিলে মাখন-সরে হতেন জোয়ান কেমন করে
(আর) ঘায়েল করতেন কংসাসুরে কেমন করে ব্রজের কানাই?

পেটের দায়

বলেছিলাম পুত্র তোমার
কার্তিকটি—সোনার চাঁদ,
মিথ্যে কথা, গোবর গণেশ,
আহা কিবা ছিরির ছাঁদ!
মন যোগাতে বলেছিলাম
মেয়ে গুলোয় পরীর দল,
রক্ষা কালীর বাচ্চা ওরা
অশোকবনের চেড়ির দল।
রূপে তুমি মদন মোহন
বলেছিলাম হয় স্মরণ,
সত্যি কিন্তু শমন-বাহন
এমনি তুমি কুদর্শন।
আয়নাতে মুখ দেখলে পরে
থাকবে না সন্দেহ তায়,
তবে কেন বলেছিলাম?
কেন জান? পেটের দায়।
বলেছিলাম পুণ্যে তুমি
স্বয়ং যেন যুধিষ্ঠির,
ন্যায়-ধর্মের প্রতিপালক
পয়গম্বর সত্যপীর,
আসল কথা—তুমি একটি
ভীষণ রকম পা-ষ-ণ্ড
অত্যাচারী দৈত্য তুমি
ভোগ-গর্দভ বা ষণ্ড।
বলেছিলাম দাতা তুমি
বলির মতন গুণধাম,
আরে রামঃ, সকাল বেলায়
কেউ করেনা তোমার নাম।

তোমার বাড়ি হতে দেখি
পিঁপড়ে গুলোও কেঁদে যায়,
সে সব কথা বলেছিলাম,
কেন জান? পেটের দায়।
বলেছিলাম জ্ঞানী তুমি
সর্ব বিদ্যায় বিশারদ,
তুমি গেলে পূরণ করতে
পারবেনা কেউ তোমার পদ।
মিথ্যে সবি। তোমার মতন
নেইকো মূঢ় দুনিয়ায়,
অকালকুষ্মাণ্ড তুমি
জড়ভরতও বলা যায়।
গিন্নী তোমার অন্নপূর্ণা?
নেইকো এতে সত্য লেশ,
গয়নাতে গা, কাটলেটে পেট
ভরতে তিনি শক্ত বেশ।
লক্ষ্মীর হাতে আঢ়ি কিনা
একটি মুঠোও কেউ না পায়
তবে যে সব বলেছিলাম,
সেটা কেবল পেটের দায়।
বলেছিলাম তোমায় আমি
আভিজাত্যে পুরন্দর,
সমাজপতি মহাকুলীন
সৌরকুলের ধুরন্ধর!
আরে রামঃ, তোমার বাড়ি
পা-ধুলে বা পাতলে পাত,
নেহাৎ যে জন অনাচারী
থাকেনাকো তারো জাত।
তবে যে ঐ পোলাও খেতাম
করে আমার ঘাড়টি হেট
সে এই দগ্ধোদরস্যার্থে
অর্থাৎ ভরতে পোড়া পেট।
অনেক মিছেই বলিয়াছি
তৈল ঢালি গোদা পায়,
কেন বলেছিলাম জানো?
শুদ্ধ কেবল পেটের দায়।

লঙ্কা-মরিচ

ছিলি ওরে লঙ্কামরিচ, সাগর পারে লঙ্কাদ্বীপে।
ছিলিরে সু-মালীর বাগে ছিলিরে তুই সোনার ঢিপে।
সুর্মা কাজল করে তোকে
শূর্পণখা আঁকত চোখে।
চোলাই করে পিইত তোরে,
রাক্ষসেরা পিপে-পিপে।
লঙ্কা-মরিচ আখ্যা পেলি
ছিলি বলে লঙ্কা দ্বীপে।
তোরে সেজে গড়গড়িতে
রাবণ রাজা গুরুক খেত।
নস্যিটি তোর নাকে গুঁজে
কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে যেত।
মন্দোদরি মাখ্‌ত সুখে
তোরই আতর গায়ে মুখে,
তোর ঝাঁচি না থাক্‌লে পানে
পানগুলো তার লাগত তেঁতো।
চা-র বদলে বারবাহু বীর
সিদ্ধ করে তোরেই খেত।
তোর ধোঁয়াতেই ধূম্রলোচন
নর-বানরে দগ্ধ করে।
তোর ধোঁয়াতেই রাক্ষসীরা
শুকাত চুল স্নানের পরে।
হলুদ বাঁটা তোরই সাথে
মাখত তারা আগুন-ভাতে।
তোরই সুরস দিত তারা
শিশুর মুখে আঁতুর ঘরে,
তোরই পায়স দিত তারা
জামাই এলে আদর ভরে।
পহিলা চাষ করল যে তোর,
নামটি তাহার মারিচ হল।
তোর ঝাঁঝিতেই বিশ্ব ভরে
তাদের এত প্রতাপ বলও।
জন্মালিনে সে বার ক্ষেতে
তোর অভাবে আকালেতে,

রাক্ষসের নির্বংশ হল
        দলে-দলে সবাই মলো।
বানর সেনা তুচ্ছ, কি আর
        লঙ্কাপুরীর করলে বলো?
লঙ্কা জিনি বিজয় সিংহ
        ফিরল যখন বাংলাদেশে,
প্রবাল ভেবে বিজয়-চিহ্ন—
        স্বরূপ তোরে আনল শেষে।
    পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলী
    গায় জয় তোর লহর তুলি।
গাঙাল দেশের রান্নাঘরে
        যদিও তুই কাঙাল বেশে,
রাঙা মানিক আজো আছিস্
        সমাদৃত বাঙাল দেশে।

তোর সমাদর করতে আমি
        পারি না হায় বিশেষ মতো,
অনেক জ্বালায় জ্বলছি আমি
        তোর জ্বালা আর সইব কত?
তবু, তোর সমাদর বাড়বে যতই
    ভাতের অভাব ঘুচবে ততই
রবে কি আর অন্নশূলীর
        ভাতের প্রয়োজনটা ততো?
পেটের জ্বালা থাকবে না আর
        তুই যদি রোস কণ্ঠাগত।

নস্য

লস্য লিয়ে-লিয়ে লাকের সগ্‌গা লাহি ভাইরে,
ভর্‌ভরে এই লাকে আমার গন্ধ লাহি পাইরে
    গভ্‌ভরটা হচ্ছে বড়
    যাচ্ছে চলে যতই ভরো,
তালুর খোলে হচ্ছে জড়ো তামাকপাতার ছাই রে।
কাস্‌লে পড়ে আলকাৎরা হাঁচলে উড়ে কালীর ছিটে,
সমান আমার বিষ্ঠা আতর বোটকা পচা টাটকা মিঠে।

লোকে বলে লাকের মাঝে
জীব জন্‌তু অনেক রাজে
গর্জে তারা লালাস্বরে লিদ্রা যবে যাইরে।
লোকে বলে ল্যাষ্টি আমায়, লাকের জলে লোংরা পুঁথি,
ধোপার-বাপের শ্রাদ্ধ-করা লোংরা আমার চাদর ধুতি।
গাইয়েরা সব বেজায় খোনা
ছেড়েছি গাল্‌বাজনা শোনা,
গগ্‌গা লারায়ল ব্রোভ্‌ভে লাবার ঘাটে গাইরে।

প্রশান্তি

ফুলের মধ্যে শিমুল তুমি, ফলের মধ্যে মাকাল,
গাছের মধ্যে ভুতো শেওড়া মাছের মধ্যে পাঁকাল।
নেশার মধ্যে চরস গাঁজা,
চাষার রাজ্যে শুকো হাজা,
আমার ঘরে বিরাজ করে মুর্তিমন্ত আকাল।

চালের মধ্যে আউশ তুমি ডালের মধ্যে খেসারি,
পাড়ার লোকের কানের জ্বালা জাতের মধ্যে কাঁসারি।

চিরসুন্দর

ওগো সুন্দর, পরমানন্দ, সুন্দর তব বিশ্বভূমি,
স্রষ্ট্-মাধুরী লভেছে সৃষ্টি, ধ্বংসেও আছ কান্ত তুমি।
মঙ্গল-ঘট নিঃশেষ করি রুদ্রও তব পারেনি পি'তে।
ভীষণেও আছে অ-লোক কান্তি তব রচনার সাক্ষ্য দিতে।
মরু মনোহর মরীচিকাহারে, মেরু মনোহর অরোরালোকে,
গহন, কুসুমে,—অরবিচন্দ্র নিশীথ-গগন তারার চোখে।
সাগরগর্ভ রত্নছটায়—উপকূল-কূল তমালতালে,
অশনি তড়িতে, গিরিদরীগুহা যোগীর জটার রশ্মিজালে।
ভূধরশৃঙ্গ তুষারপুঞ্জে—উষার অরুণ পট্টবাসে,
মশান শোভন দেবীর বোধনে, শ্মশান শিবের অট্টহাসে।

প্রান্তর আলো আলেয়ামালায়, বর্ণে বিম্ব, স্বর্ণে খনি,
বন্য আঁধার, খদ্যোতিকায়, সিংহ, কেশরে, মণিতে, ফণী।
বন্যা শোভন উর্বরতায়, পঙ্কের শোভা পদ্মমালা,
কোকিল-মধুপ, কুজন-গুঞ্জে, শীতল ছায়ায় রৌদ্রজ্বালা।
শৈশব চারু অকারণ হাসে, যৌবন চারু, প্রেমের স্বাদে,
পলিত জরাও সৌম্য-শোভন তোমার শুভ্র আশীর্বাদে।
দৈন্য শোভন শম-সংযমে, বিরহ শোভন প্রিয়ের ধ্যানে,
প্রসব-বেদনা অঙ্ক-শশীতে, কৃচ্ছ্রসাধনা সিদ্ধি-জ্ঞানে।
বিয়োগ-বিলাপে কাতর কণ্ঠ শোভন, অশ্রু মুকুতাহারে,
মরণো মধুর তোমার চরণ-সরোজ-মধুতে ধরার পারে।

বৌ-দিদি

(গার্হস্থ্য-চিত্র)

বধূর লজ্জা, মায়ের আদর, ভগিনীর ভালোবাসা,
রোগে-তাপে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, অশ্রু-পাথারে আশা,-

আরো যে কতই বিলায়ে মাধুরী মিলায়ে গড়িয়া বিধি
এই বঙ্গের ঘরে-ঘরে তোমা পাঠায়েছে, বৌ-দিদি।

দেশের ভাগ্য-ভবিষ্যতের আশা-নিকেতন যারা,
তোমার নয়ন-পল্লব-ছায় মানুষ হতেছে তারা।
তোমারি রক্ষা-কবচ বাঁধিয়া সাধনায় ধাই মোরা
জীবন-সমরে বলাধান করে তোমার রাখির ডোরা।
যদি ক্ষতি-ক্ষয় লাজ-পরাজয় ভাগ্যে কখনো জুটে,
তপ্ত জীবন জুড়াবার লাগি শ্রীচরণে আসি ছুটে।

চীনে-করবীর কলিকার মতো তোমার আঙুল-গুলি
বিনত শীর্ষে চিকুরের ফাঁকে মুছে দেয় সব ধূলি।
ভ্রাতৃভবন তেয়াগিয়ে এসে ভাই করে লও পরে,
দেবর-জন্মে পরম বন্ধু বাঙালির ঘরে-ঘরে।

অবোধ-অবলা বলি তব কথা করে না সে কভু ঘৃণা,
কোনো কাজ ভুলে করে না সে মূলে তব মন্ত্রণা বিনা।
তোমার আদেশ তাহার শীর্ষে সব নিদেশের বাড়া,
সব উপরোধ ঠেলিতে সে পারে তব অনুরোধ ছাড়া।

তোমার শ্রবণে কি ভূষণ রাজে দেখেনি সে চোখ তুলে,
চিনে ভালো করে নূপুর দুটিরে তোমার চরণমূলে।
জানে না সে তারি দেওয়া হেম-হারে কণ্ঠ তোমার সাজে,
হেমবিনিময়ে ক্ষেম সে লভেছে ও পদ-রেণুর মাঝে।
তোমারে ভক্তি করিতে সে চিনে রমণীর মহিমায়,
নিখিল নারীরে শ্রদ্ধা করিতে শিখেছে সে তব পায়।
দেবরেরে স্নেহ করিতে তোমারো মাতৃমমতা শেখা
সন্তানে লভে পূর্ণতা সেই স্নেহের ইন্দুলেখা।

মাতৃহারার তুমি হও মাতা অসহায়ে লও টেনে,
আপন স্তন্যে বাঁচাও তাহার সন্তানসম জেনে।
মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে বরণডালাটি শিরে,
আপন অঙ্কে বরি লও তার লাজনত বধূটিরে।
ভগিনীহীনের তুমিই ভগিনী সহচরী একাধারে,
শুভ কার্তিক দ্বিতীয়ার ফোঁটা মনে-মনে দাও তারে।

তোমার চরণে দেবরের শিরে মধুর মিলন ভবে,
উভয় পরশে উভয়ই মেধ্য স্বর্গীয় গৌরবে ;

তব চরণেরে ধন্য করেছে দেবরের কেশগুলি,
ধন্য করেছে দেবরের শিরে তোমার চরণধূলি।
যুগে যুগে তুমি ভরতে গড়িছ, ঘরে ঘরে লক্ষ্মণে,
তোমার লাগিয়া ধরিতেছে জটা তাহারা ভবনে বনে।
স্বসারূপে তুমি চিরস্নেহময়ী, বধূরূপে তুমি সতী,
বৌ-দিদিরূপে বঙ্গের গৃহে সব হতে গুণবতী।

কবীরের প্রার্থনা

জাগ্‌বে কবে আমার, মাঝে কবে এমন হবে?
দিশি দিশি বিশ্ব ভরি দেখ্‌ব তোমায় কবে?
      আমার সকল চিন্তা গেয়ান,
      হয়ে যাবে তোমার ধেয়ান।
সকল শ্বসন ভরবে পূজা-ধূপজ সৌরভে।

সকল চলন হবে আমার তোমায় প্রদক্ষিণ,
সকল শয়ন তোমায় প্রণাম হবে সে কোন্‌ দিন?
      সকল চেষ্টা সব সাধনা
      হবে তোমার আরাধনা,
সব আনন্দ ভরবে তোমার প্রেমেরি গৌরবে।
সকল কথা হবে কবে তোমার নামাবলী,
—এ রসনার রসপুটে বাঙ্ময়ী অঞ্জলি।
      সকল শ্রবণ ভরবে, প্রভো,
      আশীর্বচন-সুধায় তব,
সারা জীবন মাতবে আমার তোমার প্রেমোৎসবে।

যৌবন-প্রশস্তি

বিশ্বের যত মাধুরী আহরি করি তায় প্রেম-বৃষ্টি,
যৌবন তোমা রচিল বিধাতা, তুমি তাঁর পরা সৃষ্টি।
কুৎসিতে তুমি কর শ্রীমন্ত, কর্কশে কর কান্ত,
তব আতিথ্যে 'পাথেয়বন্ত' মানসসরের পান্থ।

তোমা লাগি ফুটে নীলিমায় তারা, শ্যামলে কুসুমপুঞ্জ,
ঝুলনদোলায় রভস-লীলায় তব রসে ভরে কুঞ্জ।
তুমি আছ বলি বিশ্ব পুলকি এত রূপ, রস, গন্ধ,
গৃহে-গৃহে ছুটে তোমার লাগিয়া উৎসবে প্রেমানন্দ।

তুমি ভোগী, মধুপর্কের মতো ধরণী তোমার ভোগ্য,
যোড়শোপচারে বিশ্ব রচিত হইতে তোমারি যোগ্য।
ভাবরস ধরে মোহন মূর্তি তোমার ধ্যানের-নেত্রে,
কল্পলক্ষ্মী কমলাত্মিকা তোমার মানস-ক্ষেত্রে।

'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' করেছ সৃষ্টি রম্য,
প্রেম-দ্যুলোকের অ-লোক সুষমা তোমারি দৃষ্টিগম্য।
কল্পনা তব জলধনুময়ী অপরূপ নানা বর্ণে,
অঙ্গুলি তব মৃৎপ্রস্তরে পরিণত করে স্বর্ণে।

তুমি বীর, দেশমাতার লাগিয়া কর প্রাণ উৎসর্গ,
রক্তসিন্ধু সন্তরি তুমি লভ কূলে অপবর্গ।
তব মুখে প্রাণ-মারুতে ধ্বনিত যুগে-যুগে জয়শঙ্খ,
সপ্তরথীতে বেষ্টিত ব্যূহে পশ তুমি নিঃশঙ্ক।

তুমি বিধাতার সৃষ্টিধর্ম পাইয়াছ তুমি স্রষ্টা,
রহি জীবনের তুঙ্গ শিখরে তুমিই বিশ্বদ্রষ্টা।
তোমারি ত্যাগের সম্বল আছে, ত্যাগী জানে তোমা বিশ্ব,
তোমারেই সাজে ত্যাগের ধর্ম, কি ত্যাগ করিবে নিঃস্ব?

জীবনের ব্রতে অমৃতের পথে জয় কর দ্বিধাদ্বন্দ্ব,
বুদ্ধ-নিমাই-শঙ্করে তুমি করেছ ভুবন-বন্দ্য॥

টবের গাছ

বন্দী আমি বারেন্দাতে টবের চারা গাছ,
খাঁচায় পোষা ময়না পাখি, চৌবাচ্চায় মাছ।
উজল রবিচন্দ্র করে নাই নীলাকাশ মাথার 'পরে
পাইনা শিশির পাইনা হাওয়া পাইনা আলোর আঁচ।

মায়ের বুকের স্তন্য-রসের অধিকারীই নই,
মাতৃহারা শিশুর মতো দাইয়ের বুকেই রই।

বোতল ভরা দুধের মতো   ঝারির বারি পাই যা যত
হায়রে তাতে মায়ের দুধের তৃষ্ণা মিটে কই?

আহা যদি ঐ মাটিতে নীল আকাশের তলে,
একটুখানি জায়গা পেতাম তরুলতার দলে,
সবার সাথে অশেষ আশায়   আলো হাওয়ার ভালোবাসায়
ফন-ফনিয়ে বেড়ে হতাম শোভন ফুলে-ফলে।

আহা যদি ঐ কাননে একটু পেতাম ঠাঁই—
ঘনশ্যামল হর্ষে যথা দুলছে সকল ভাই—
শাখায়-শাখায় গলাগলি   মনের কথা বলাবলি
কতই হতো, ভাবতে গেলে পুলকে চম্‌কাই।

বনের পাখি শাখায় বসে গাইত কতই গান,
কুলায় রচি করত মুখর আমার শ্যামল প্রাণ।
হয়তো কোন লতা মোরে   জড়াইত বাহুর ডোরে,
মৌমাছিরা করত শাখায় মৌচাকও নির্মাণ।

জানি আমি, করকাঘাত, গ্রীষ্ম দাহ খর,
শ্রাবণ ধারা সহ্য করা কঠিন বটে বড়।
জানি আমি ঝড়ের দাপে   শাখাও ভাঙে পরান কাঁপে
তবু সকল দুখেও স্বাধীন জীবন প্রিয়তর।

ছিঁড়ত পাতা, ভাঙ্‌ত শাখা, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে
দপদপিয়ে ছুটত শোণিত আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
ভেঙে-চুরে দ্বিগুণ জোরে   অটুট জীবন উঠত গড়ে
ডুব্‌ত সকল ক্ষয় বা ক্ষতি, প্রচণ্ড উল্লাসে।

স্বপ্ন সবি, ওসব কথা বলে কি আর হবে?
বামন-জীবন বইতে হবে গণ্ডী ঘেরা টবে,
বাধা পেয়ে শিকড় যথা   ফিরে এসে জানায় ব্যথা ;
জানি না এই টবের জীবন শেষ হবে বা কবে?

তবু আমায় হাস্‌তে হবে নেইকো পরিত্রাণ,
উৎসবে হায় করতে হবে আনন্দেরি ভান,
বুকের রুধির নিঙড়ে হেসে   ফুল ফুটাতেও হবে শেষে,
সব দণ্ডের চেয়ে ইহাই কাতর করে প্রাণ।

বন্ধ্যার খেদ

কুঞ্জে আমার ফুট্‌লনা ফুল, ফল্‌ল না ফল বাগানে,
বাজ্‌ল না শাঁখ আমার আঙিনায়,
বৎসলতার উৎসধারা ছুট্‌ল না হৃৎ-পাষাণে
মা বলে কেউ ডাকলনাকো হায়।
আমার নারী-জীবন চূড়ায় বাজ্‌লনাকো ডঙ্কা রে
শূন্য আমার ময়ূর-সিংহাসন,
হল না হায় গৃহে আমার ঝিনুক-বাটির ঝঙ্কারে
বালগোপালের সোহাগ আমন্ত্রণ।
আমার শোণিত-সিন্ধু মথি চন্দ্রমা তো উঠ্‌ল না
ঘুচলনা মোর প্রাণের আঁধার ঘোর
আমার বুকের পাঁজর গলে ক্ষীরের ধারা ছুট্‌ল না
ইহজীবন বৃথায় গেল মোর।

গয়না গায়ে পরি না আর, শুধুই তামার মাদুলি
করিয়াছি দেহের আভরণ।
পীর-দরগায় শিন্নী দেছি অনেক টাকা আধুলি,
পূরল কৈ আর আমার আকিঞ্চন?
বাবার ঠাঁয়ে ধন্না দিয়া নীলের ব্রত পেলেছি
করেছি হায় অনেক উপবাস,
তীর্থে গেছি পায়ে হেঁটে, সাগরে গা ঢেলেছি,
যে যা বলে করেছি বিশ্বাস।
বুক চিরে মোর রক্ত দিয়ে পূজেছি মায় ভক্তিতে
বিন্ধ্যাচলে, কামাখ্যা-মার পাহাড়ে।
তোমরা কি কেউ বল্‌তে পারো কোন্ সাধনা-শক্তিতে
কোলটি আমার উজল হবে, আহা-রে?

* *

কেমন সে যে দেখ্‌তে হবে কতই করি কল্পনা—
দেব তাহায় কি কি অলঙ্কার,
'ভুজোনো' তার কেমন হবে তাই নিয়ে হয় জল্পনা,
দাইকে আমি দিব গলার হার।
আদর করে ডাকব বলে করেছি হায় পছন্দ
কত নাম, যা নেইকো গোটা গাঁয়,
কোথায় আমার যাদুমানিক জীবনভরা আনন্দ
আসবি কবে? সময় বয়ে যায়।

তাহায় নিয়ে করব আমি স্বামীর সাথে কলহ
কি অছিলায়, তাও করেছি ঠিক,
তারে কিছু বললে পরে হবে আমার অসহ
বল্‌ব আমি 'অমন বাপে ধিক্‌'।
রেখেছি তার ঝিনুক কিনে, ছোট্ট থালা দুধ-বাটি,
চোষন-কাঠি খেল্‌না ভারে ভার।
বস্‌বে বলে আসনখানি বুনিয়াছি ফুল কাটি
পরবে বলে টুপিটি ফুলদার।
খুকি হলে পরবে বলে ছোট বেলার অলঙ্কার
একখানিও আজো ভাঙি নেই।
বড় হয়ে পরবে বলে বেনারসী কল্কাপাড়
পরিনাকো, বাক্সে রেখে দেই।
শিখেছিলাম উপকথা-ছড়া শোলক-পাঁচালী
জানি কত ঘুম-পাড়ানি গান,
সে সব আমার কে শুনিবে কোথায় দুলালদুলালি?
সে সব আমার কার জুড়াবে কান?

বুক যে আমার আঁৎকে উঠে শিশুর কাঁদন-সাড়াতে
আপন ঘরে কেঁদেই সারা হই,
ইচ্ছা করে ছেলে পুলেয় মারলে কেহ পাড়াতে
ছুটে গিয়ে আঁকড়ে চুমে লই।
কাজ খুঁজে না পাই এ ঘরে বসে থাকি জানালায়
হেরি পথে শিশুর মহোৎসব,
হেরি ছেলের কাঁথা দোলে পাশের বাড়ির আনালায়
শুনি পাড়ায় ছেলের কলরব,
ওরা-তো কেউ নয়কো আমার, হায়রে আমার কোল খালি
কিসের লাগি ভুতের এ সংসার?
সন্ধ্যা হলেও, যায়নাকো সাধ উঠে গিয়ে দীপ জ্বালি,
যাবে কি তায় গৃহের আঁধিয়ার?

* * *

দিবস আমার কাটেনা যে শূন্য ঘরে ভগবান্‌,
শেষ করো মোর অলস অবসর।
অবকাশের দুহ্-জ্বালা করো দয়াল অবসান,
যজ্ঞে তোমার লও এ কলেবর।

ধূলায়-কাদায় গড়াগড়ি অনেক ঘরে বাছারা,
ছেলের জ্বালায় হচ্ছে জ্বালাতন,
যাদের ঘরে ঠাঁই মোটে নাই ভাত জোটেনা তাছাড়া
তাদের ঘরেই পাঠাও অগণন।
হাড়ির মেয়ের, বনবাদারে কাঠ কুড়াতে গিয়ে যে
হচ্ছে ছেলে কুর্চি গাছের ছায়,
আপন হাতেই নাড়ি কেটে আস্‌ছে ছেলেয় নিয়ে, সে
অনিচ্ছাতেও বছর-বছর পায়।

চায় না যারা তাদের ঘরেই পাঠাবে আর কতবা?
একটি দিয়ে পুরাও আমার সাধ,
একটি কালো, খাঁদা, খোঁড়া, কানা, কুঁজো অথবা
সেই হবে মোর মানিক সোনার চাঁদ,
আর জনমে হায় ভগবান্, করেছিলাম পদাঘাত
কার বাছারে? আহা মরে যাই,
এ জনমে শাস্তি তারি সচ্ছি বুঝি দিবারাত
একটি বাছাও অঙ্কে নাহি পাই।
কোথায় আছিস্ কাঁদাসনে আর, দুঃখি মায়ে আয়রে আয়,
আয়রে বাছা মা ষষ্ঠীর ধন।
তোর বিহনে সোনার ভবন শ্মশান হয়ে যায়রে হায়
উপবাসী পিতৃপুরুষগণ।
বৃথাই আমার ধেনুর সেবা, ফুলের গাছে জল ঢালা,
ঝলসি যায় অই তুলসী বন,
লক্ষ্মী গেলেন ঝাঁপি কাঁখে, ষষ্ঠী মা যে খই ডালা
বিমুখ হয়ে বাঁ-হাতে হায় লন।
খেলার সাথী না পেয়ে যে বাল গোপাল হায় আস্‌ল না ;
বন্ধ হেথা নান্দীমুখের যাগ,
খাঁ-খাঁ করে এ ঘর দুয়ার নাই আঙ্গিনায় আল্‌পনা,
দেওয়ালে নেই বসুধারার দাগ।
দুলাল হয়ে কতদিন আর দেখবি রে তুই মায়ের দুখ
আর কতকাল কাঁদাবি, বাপ, বল্,
কে ঘুচাবে কলঙ্ক মার রাখ্‌বে কে রে মায়ের মুখ?
পবিত্র কর মায়ের হাতের জল।
বাল্য হতে পুতুল খেলায় করেছি তোর আবাহন
তোর লাগি এই যৌবনে সংসার,
পূর্ণ কররে নারীত্ব মোর কররে সফল আকিঞ্চন
ধন্য হউক সৃষ্টি বিধাতার।

জীবনভরা পুঁজি দিলেও তোরে যদি পাইরে আজ,
তাইরে বাঞ্ছা দেব মোরা তাই,
পথে-পথে ভিক্ষা মেগে খাওয়াব তোয়, নাইরে লাজ
এ জীবনে তোরেই শুধু চাই।

প্রথম পরিচয়

বর্ষা বাদল বাজায় মাদল মেঘের বনে
অবাক হয়ে দুষ্ট খোকা বাজনা শোনে,
বিশ্বভুবন হঠাৎ এমন পাগল পারা
দেখে খোকন হল কেমন আত্মহারা।
আকাশ শিশুর দস্যুপনা যতই নামে
ঘরের শিশুর দাপাদাপি ততই থামে।
দুষ্টু শোনে শূন্য মনে ঘরের কোণে ;
দেবশিশুদল বাজায় মাদল মেঘের বনে।

আজকে সে গো পান করেছে কিসের সুধা?
ভুলে গেছে একবারে যে তৃষ্ণা ক্ষুধা।
অবাক হয়ে দাওয়ায় রয়ে বিকেলবেলা
হেরে সে যে গগন মাঝে তড়িৎ খেলা।
মেঘের ধ্বনি শুনি সে তো সন্ধ্যা হলে
দুরুদুরু বুকে লুকায় মায়ের কোলে।
আকাশ-পাতাল কি ভাবে আজ আপন মনে,
দেবশিশুদল বাজায় মাদল মেঘের বনে।

মোহন সুদূর গহন যাদুর মধুর গীতে
আজকে প্রথম বিস্মিতি তার জন্মে চিতে।
আশঙ্কা ও আনন্দেরই মিশ্ররসে
প্রকৃতি আজ তাহার প্রাণে প্রথম পশে।
আজকে প্রথম মাধুরী তার মানস হরে
আনন্দ আজ প্রথম তাহার জিনল ডরে,
মনের মাঝে আজকে প্রথম স্বপন বোনে,
পাগলা বাদল বাজায় মাদল মেঘাঙ্গনে।

চিত্ত-দেবতা

দেবতা চলিয়া গেছ এ মন্দির হতে,
মূর্তি তব গেছে ভাসি ক্ষুব্ধ জন-স্রোতে
স্বর্গঙ্গার পূত নীরে। হেথা অভ্রভেদী
শূন্য পড়ে দেশ বক্ষোবেদনার বেদী।
অভ্যাসের বশে লয়ে প্রসূন-চন্দন
তেমনি বসিয়া আছি, আজিকে ক্রন্দন
বন্দনার সব মন্ত্র দিয়াছে ডুবায়ে,
রুধিয়া কণ্ঠের শঙ্খ, হোমাগ্নি নিভায়ে।
সিন্দূর গলিয়া হল শোণিতের ধারা
গলে যায় যাট-কোটি নয়নের তারা।
তবু তব পুণ্যাসনে অন্য দেবতায়
বরিব না। রব বসি তব নন্দীগাঁয়
বন্দি তব পাদুকায় সকলে ঘিরিয়া,
মাতৃসত্য পালি তুমি আসিবে ফিরিয়া।

চিত্ত-বিয়োগে

তাপস-দুর্লভ লোকে যাও যোগী,—কবি—তপোধন,
তোমার জীবন ধন্য, আরো ধন্য তোমার মরণ।
মূঢ় মোরা করি শোক, শুধু তুমি ভূলোকের নহ,
ধন্য হোক স্বর্গলোক, দেবতারো ঘুচুক বিরহ।
মরণে রচিলে ইহ—পরত্রের সম্মিলন-সেতু,
মর্ত্যবুকে ধবজদণ্ড, স্বর্গে তব উড়ে জয়কেতু।
নশ্বরে করিয়া ভস্ম, দুই ভাগ করিলে শাশ্বতে,
আত্মা গেল আত্মধামে, রয়ে গেল সাধনা ভারতে।

সবি যায়,—দেশে-দেশে যুগে-যুগে সাধনাই বাঁচে,
দেহব্যবধান-হারা হয়ে সে যে আসে আরো কাছে।
মোরা হেরিতাম তোমা কেন্দ্রীভূত একটি তনুতে,
আজি হেরিতেছি ব্যাপ্ত এদেশের অণুতে-অণুতে,
ঐক্যে, সখ্য-আলিঙ্গনে, তরুণের উৎসাহ আশায়,
প্রতি অশ্রুবিন্দু-বুকে, চিত্রে, গীতে, কবির ভাষায়,
দেশের নিজত্ব-বোধে, আত্মোদয় ব্রতের শিক্ষায়,
জাতির 'দ্বিজত্ব-বোধে', নবজন্মে প্রণব-দীক্ষায়
স্ব-প্রতিষ্ঠ ভারতের গর্ভ-ভ্রূণ-ললাট-লেখায়,
প্রত্যাসন্ন বিজয়ের ধবজালিপি-রেখায়-রেখায়।
তোমা হেরিতেছি নব জীবনের অঙ্কুরে-অঙ্কুরে,
প্রত্যেক রোমাঞ্চে অঙ্গে, গেহে-গেহে সারাবঙ্গ জুড়ে,
সত্যোদয়ে, মিথ্যাজয়ে, সংকল্পিত ব্রতের বরণে,
প্রতিদণ্ডপলে, দূর ভবিষ্যরও দিগন্তের কোণে।
এক 'চিত্ত' হইয়াছ লক্ষ চিত্ত জড়ে চেতনায়,
এক 'নিত্য' যেন আজি প্রকটিত বসুধা ভূমায়।
এক চন্দ্র প্রতিবিম্বে লক্ষচন্দ্র জনসিন্ধুময়,
চূর্ণ করি আপনারে, পূর্ণতায় লভিয়াছ জয়।
বহিশ্চর চিত্ত তুমি ভারতের ছিলে এতদিন,
প্রতি স্নায়ু-রক্তকণা মাঝে তার হইলে বিলীন।
তব ভস্ম, মহাকাল অঙ্গে মাখি করিল ভূষণ,
যুগে-যুগে, কল্পে-কল্পে ব্যাপ্ত হলে, হে চিত্তরঞ্জন।

চিত্ত-চিতা

শীর্ণ দেশের ব্যথার-ঘুণে-জীর্ণ পাঁজর চূর্ণ আজ,
হায় বিধি হায়, হল কি ন্যায়-দণ্ড-বিধান পূর্ণ আজ?
রুদ্র, তোমার উদ্যত রোষ করবেনাকো সংহরণ?
আর কতকাল ও শূল করাল করবে ভয়াল সঞ্চরণ?
ভাঙছে 'বোধিদ্রুমের' শাখা, ভাঙছে মলয়-বিন্ধ্যশির,
মীনার চূড়া করছে গুঁড়া, সৃষ্টি নাশি শতাব্দীর।
যেমনি মাথা তোলে এদেশ অমনি কর বজ্রাঘাত,
প্রবাল-কীটের সাধনা তার ভস্ম কর অকস্মাৎ।
পথের সেতু রথের কেতু মুহুর্মুহুই ভগ্ন হয়,
বাঞ্ছা তোমার লাঞ্ছিত দেশ, পঙ্কতলেই মগ্ন রয়?

ভারত-জনারণ্যে আজি কি দাবানল জ্বাল্‌লে হায়,
আশার গহন শ্যামল স্বপন, মুক্তি-জীবন, দগ্ধ তায়।
জ্বাললে দেশের চিত্তে চিতা, এই কি তোমার চিত্তমেধ?
চিত্তে আজি চিন্তা-চিতায় রাখ্‌লেনাকো ভিন্ন-ভেদ।
তৃপ্ত হল ললাট-অনল মোদের হৃদয়-খাণ্ডবে,
চণ্ড, এখন ভস্ম মেখে নৃত্য কর তাণ্ডবে।
ভারতজোড়া শ্মশান আজি পূর্‌ল তোমার মনস্কাম,
প্রেতের সাথে রাজ্য কর অট্টহাসে রুদ্র বাম।

কঠোর অনল-পরীক্ষা তোর, দুঃখী হতভাগ্য দেশ,
তুষানলের তৃষায় পুড়েও হয়নি প্রায়শ্চিত্ত শেষ?
পাপের কি তোর অন্ত আছে? কোথায় রে তোর ধর্মবল?
এত যুগের দণ্ডাঘাতেও ঝর্‌ছে না তোর কর্মফল।
অনেক পুরুষ ধরে শুধুই মরিস্‌ ভুগে কুম্ভীপাক,
দম্ভ বৃথা, পুণ্য কোথা? রেখে দে তোর শূন্যজাঁক।
নইলে কেন বজ্রআঁটন হচ্চে ক্রমে দাস্যপাশ,
বিধির রোষে নান্দীমুখেই অধিবাসেই সর্বনাশ!
শুদ্ধি বিধান দিল এবার দুর্বিষহ পুত্রশোক,
অভিশাপের মোচন তরে শোচন-পুরশ্চরণ হোক্‌।
শোকের পাষাণ বক্ষে বহি, চোখের জলে রাত্রিদিন
অনুতাপের বহ্নিতাপে কর্‌রে শাপের প্রতাপ ক্ষীণ।
পুণ্যহ্রাসে কালের গ্রাসে, সহায়-সাহস-বিত্ত তোর,
চিত্ত গেল সত্যলোকে থাক্‌ল প্রায়শ্চিত্ত ঘোর।
ভারতবাসি, আজকে তুমি দেখ্‌ছ যাতে অন্ধকার,
সতর্কতার অনুশাসন জেন তা সেই নিয়ন্তার।
কঠোর তপশ্চরণ বিনা মিলবে না সেই মুক্তিজয়,
মিল্‌বে তপে আত্মলোপে, ভিক্ষাতে নয় শাঠ্যে নয়।
গুল্মলতা বল্মীকে এই অঙ্গ ঢাকুক, তপ করো,
চিত্ত-যোগীর মন্ত্রটিকে নিত্য অযুত জপ করো।
ইন্দ্রগণের ইন্দ্রিয়দের সব প্রলোভন জয় করি
বিষ্ণুচরণ স্নিগ্ধ করো পুঞ্জিত পাপ ক্ষয় করি।
পুড়্‌ল যাতে ত্যাগীর তনু অদ্য তাতেই দীক্ষা হোক,
অক্ষয় রোক তোমার মনের সদ্যোজাত স্বর্গলোক।
সমান ব্যসন সবার শিরে শ্মশান-নিরানন্দ দেশ,
পাবন স্মৃতির শাসনতলে বিলোপ কর দ্বন্দ্ব দ্বেষ।
বাঁটতে এসে মুক্তিসুধা লাভ হল যার ব্যর্থতাই
মরণ-পাথার মথি তাহায় সুধার সাথে ফিরাও ভাই।

শোকের মাঝেই অশোক লোকের পথটি চিনে লও সবে,
ভিক্ষু অশোক কিরীট শিরে আসুক ফিরে গৌরবে।
এই শশ্মানের যজ্ঞশালায় নবীন জীবন হোক সুরু,
জীবনে দেশবন্ধু যে, সে মরণে হোক দেশগুরু।
মুক্তি মিলাক গঙ্গা হয়ে বঙ্গভূমির শোকধারা,
তার জীবনের সন্ধ্যাতারাই হোক তোমাদের শুকতারা।

বিজয়ায়

বঙ্গভূমে আজ বিজয়ার বিদায়ব্যথা হরবে কে?
বিজয়ী নাই, জয়-অভিযান করবে কে?
আজ বিজয়া,—পরাজয়া,
ভয়দায়িনী,—আজ অভয়া,
যাত্রাপথে কে আগাবে? দিগ্বিজয়ে লড়বে কে?

সকল আশাই ভেসে গেছে এবার আষাঢ়-আসারে,
নীরব করে দিয়ে গেছে মায়ের 'মাভৈঃ' ভাষারে।
নবীন যুগের আজ প্রভাতে,
নেইকো কবি রাজসভাতে,
মগ্ন করি করুণ 'বেহাগ' 'আশাবরী' ধরবে কে?

আজ বিজয়ার মিলন-সভায় কোথায় দেশবন্ধুরে!
আলিঙ্গনের স্মৃতি তাঁহার জাগ্‌ছে পরান মন জুড়ে।
মুক্তি-বেদীর হোমের শিখা,
পরাবে কায় ভস্মটীকা?
পেশল ভুজে অপ্‌রাজিতার বলয় আজি পরবে কে?

আহরণী প্রথম সংস্করণ
১৯২৮

ছাত্রধারা

বর্ষে-বর্ষে দলে-দলে আসে বিদ্যামঠতলে,
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।
ভালোবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি,
দেখাশোনা হয় নিতি-নিতি,
শাসন-তর্জন করি শিখাই প্রহর ধরি,
থাকেনাকো, হায়, কোনো স্মৃতি!
ক-দিনের এই দেখা— সাগর সৈকতে রেখা
নূতন তরঙ্গে মুছে যায়।
ছোট-ছোট দাগ পার ঘুচে হয় একাকার
নব-নব পদ-তাড়নায়।
জানে না কে কোথা যাবে, জোটে হেথা, তাই ভাবে
পাঠশালা,—যেন পান্থশালা,
দু-দিন একত্রে মাতে, মেলে-মেশে, বসে গাঁথে
নীতি-হার, আর কথা-মালা।
রাজপথে দেখা হলে কেহ যদি গুরু বলে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসিমুখে— 'বেঁচে-বর্তে থাকো সুখে,'
স্পর্শ করি কেশগুলি তার।
ভাবিতে-ভাবিতে যাই— কি নাম? মনে তো নাই,
ছাত্র ছিল কত-দিন আগে ;
স্মৃতিসূত্র ধরি টানি, কৈশোরের মুখখানি
দেখি মনে জাগে কি না জাগে।
ঘন-ঘন আনাগোনা কতদিন দেখাশোনা,
তবু কেন মনে নাহি থাকে?
'ব্যক্তি' ডুবে যায় 'দলে', মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে?

এ জীবন ভেঙে-গড়ে   শ্যামল-সরস করে
ছাত্রধারা বয়ে চলে যায়,
ফেনিলতা-উচ্ছলতা   হয়ে যায় তুচ্ছ কথা,
উত্তালতা সকলি মিলায়।
স্বচ্ছতায় শুধু হেরি   আমার জীবন ঘেরি
ভাসে শুধু ম্লান মুখগুলি ;
ভুলে যাই হট্টগোল   অট্টহাসি-কলরোল,
ম্লান মুখ কখনো না ভুলি।
কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান,   কেহ রোগে ম্রিয়মাণ,
শ্রমে কারো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে   বন্দী হয়ে রয় ঘরে,
নেত্র কারো তন্দ্রায় অরুণ।
কেহ বাতায়ন-পাশে   চেয়ে রয় নীলাকাশে
যেন বদ্ধ পিঞ্জরের পাখি,
আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি   মন তার যায় উড়ি,
মুখে কালো ছায়াখানি রাখি।
স্মরিয়া খেলার মাঠ   কেউ ভুলে যায় পাঠ,
বুদ্ধিতে বা কারো না কুলায়,
কেহ স্মরে গেহকোণ,   স্নেহময় ভাইবোন—
ঘড়ি-পানে ঘন-ঘন চায়।
ডাকিছে উদার বায়ু   লয়ে স্বাস্থ্য লয়ে আয়ু,
ডাক শোনে বসে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী, মুখে মসী,   মেঘে ঢাকা শিশু-শশী—
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।
আর সবি গেছি ভুলি,   ভুলিনি এ মুখগুলি,
একবার মুদিলে নয়ন
আঁখিপাতা ভারি-ভারি,   ম্লান মুখ সারি-সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

শরতের ব্যথা

শরৎ-প্রভাতে রাজে মাঠ ভরি উজ্জ্বল স্বপন,
শ্যামল তরঙ্গে নাচে শরতের তরুণ তপন।
শস্যগর্ভ সুচিক্কণ গাঢ়শ্যাম ধান্য-তৃণদল
নিবিড় পীবরগুচ্ছে পুলকিত পবনচঞ্চল,

মাঝ দিয়া আলিপথে মুখ-বাঁধা লয়ে গাভীপাল
চলিয়াছে দূর মাঠে গান গাহি আনন্দে রাখাল।

করে লুব্ধ দুইপাশে স্নিগ্ধ-স্বাদু শালিতৃণ যত,
মুখ বাঁধা, তবু গাভী ভক্ষিবারে হইয়া উদ্যত
পাচনি-আঘাত পায়, হায় নিজ রক্ষকেরই হাতে।
ধান্যে-তৃণে ভেদটুকু গাভীরে যে নারিল বুঝাতে
চোখ না বাঁধিয়া কেন সে গাভীর বাঁধিল সে মুখ?
শরতের সব শোভা ম্লান করে বুভুক্ষুর বুক।
আকাশে-বাতাসে মাঠে বাজে হর্ষে রাখালের বেণু
তার মাঝে কাঁদে তাই জীবমাতা 'শ্যাম কল্পধেনু'॥

পঞ্চ শর

ওগো অনঙ্গ, তোমার পঞ্চ-কুসুম-শরের হউক জয়,
তারা—করেছে প্রিয়ার দেহে নবরূপসৃষ্টি।
আলগুঞ্জিত চূতমঞ্জরী কণ্ঠে বিঁধিয়া ব্যর্থ নয়
সে যে—প্রিয়ার বাণীতে মধু-ধারা করে বৃষ্টি।

প্রিয়ার নয়ন লভি অপাঙ্গে তোমার ধনুর নীলোৎপল
হল—আরো মদায়ত মানসহরণ-দক্ষ,
অধরে বিঁধিল চন্দ্রমল্লী হাস্যে ঝরিছে অনর্গল,
বুঝি—ভাঙিয়া দন্তে এক শর হল লক্ষ।

অরবিন্দটি বিঁধিয়া বদনে দুইভাগে হল ভগ্ন
দেখে—ভাগাভাগি ফুটি রহিয়াছে দুটি গণ্ডে,
অশোক-শায়ক চরণে বিঁধিয়া চির-অনুরাগে লগ্ন
তথা—লাক্ষা হয়েছে ভেঙে গিয়ে শতখণ্ডে।

ওগো অনঙ্গ, তোমার পঞ্চ-কুসুম-শরের হউক জয়,
হোক—ভরপুর পুন তোমার ও-তূণভাণ্ড,
মৃগীর মতন নয়ন বলিয়া মৃগী ভেবে তুমি হে রসময়,
তারে—মৃগয়া করিতে হের কি করেছ কাণ্ড!

আহরণী। ২য় সংস্করণ
(প্রথম খণ্ড)
১৯৩০

মথুরার দ্বারে

চরণে মিনতি প্রহরি তোমার বসো না অমন বেঁকে,
মোরা তোমাদের রাজারে হেরিতে এসেছি গোকুল থেকে।
ছেঁড়াধড়া-পরা পথধূলি ভরা শরীরে ঘামের রেখা ;
তাই বলে কিরে যেতে হবে ফিরে পাব না কানুর দেখা?
তুমি তো জান না, প্রহরি, তোমার রাজাটি মোদের কে!
এই ধূলিমাখা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে।
আমরা কাঙাল, অবোধ গোয়াল, সে আজ অনেক বড়।
ও চরণে ধরি তোরণ-প্রহরী, তাড়ায়ো না, দয়া কর।

আমাদের কানু তা-র কাছে যেতে তো-র পায়ে সাধাসাধি!
চোখে আসে জল মুখে আসে হাসি তাই তো হাসি কি কাঁদি!
দাঁড়াইয়া ঠায় দ্বারে ধুলা-পায় কানু শুনে তাই যদি,
কত ব্যথা মরি পাবে সে, প্রহরি, আঁখিনীরে ব'বে নদী।
রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই ছেড়েছে মোহন বাঁশি,
সেই হতে তার বুঝি মুখ ভার, নাই খেলাধুলা-হাসি।
আহা সে কত না পেয়েছে যাতনা কেঁদেছে মোদেরে ছাড়ি।
অমন করিয়া দিওনাকো ঠেলি, ভ্রূকুটি করো না দ্বারি।

কালীদহ হতে এনেছি তুলিয়া তার তরে শতদল,
যে বনে বেড়াত চরাত গোধন, সে বনের পাকা ফল ;
শাঙলীর দুধে মথিয়া নবনী, ধবলীর দুধে ক্ষীর ;
এনেছি মালতী ফুলে মালা গাঁথি, যমুনার কালো নীর।
এনেছি পাঁচনি, শিখিচূড়া, ননী, কোঁচানো রঙিন ধড়া,
বাঁশবন টুঁড়ি এনেছি বাঁশুরি যতনে ছিদ্র করা,
গোটা গোকুলের আঁখিজলে ভেজা এসেছি আশিস নিয়ে!
ভাঙা হৃদিভার রাঙা আঁখি আর,—একবার বল গিয়ে।

বলিস তাহার রোপিত লতাটি আজি ফুলে আলো করা,
ঘেরি নীপতল আসিয়াছে জল যমুনা দুকূল ভরা,

যা ছিল মুকুল এখন তা ফল, চারা বাঁধিয়াছে ঝাড়।
আদরের বুধু হয়েছে ডাগর শিশু উঠিয়াছে তার।
কোথা রবে তার রাজসভা, দ্বারি, রবে না সে গৃহকোণে
বুকে এসে ছুটে পড়িবে সে লুটে একবার যদি শোনে!
নয়ন রাঙায়ে দিও না তাড়ায়ে প্রহরী নিঠুর হিয়া,
দিব ক্ষীর, সর, বনফুল তোরে, একবার বল গিয়া।

ছত্র-বিয়োগে

বর্ষাসাথী আমার ছাতি আজকে তুমি নাই,
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।
মাথার 'পরে বাদল ঝরে তার বেশি মোর চোখেই পড়ে
অশ্রুধারা তোমার তরে, কোথায় তোমায় পাই?

চারটি টাকায় কিনেছিলাম তিনটি বছর আগে,
সঙ্গে ছিলে বাঁকড়ো, বরমপুর, হাজারিবাগে।
নতুন ছিলে যখন তুমি বুলিয়েছিলাম গালে চুমি
আজো মধুর গন্ধ পরশ স্মৃতির পুটে জাগে॥

থাকতে তুমি আমার কাঁধে, রইতে কাছে-কাছে,
আজো জামার দাগটি বাঁটের মলিন হয়ে আছে।
তোমায় জীবনসঙ্গী ভেবে নিতাম সাথে বগল দেবে,
বসলে রেখে দিতাম কোলে হারাও ভেবে পাছে॥

ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি,
গ্রীষ্মকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি।
হাত চলে না পিঠে যেথায় চুলকে দিতে তুমিই সেথায়
তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচিল 'পরে চড়ি॥

রৌদ্রে পুড়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁচিয়ে দিলে মাথা,
ওরে আমার দিলদরদী পথের সাথী ছাতা।
সেদিন যখন গ্রহের ফেরে পাগ্‌লা কুকুর আসলো তেড়ে,
তুমিই তখন মধ্যে পড়ে হলে আমার ত্রাতা॥

এড়িয়ে যেতাম আড়াল দিয়ে যতেক তাগিদদারে,
ব্যাঙের ছাতা মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারে।

নেইকো তেমন আঙুলে বল,   কাজেই লেমনেডের বোতল
তোমার ডগায় খুলে আমি খেইছি পথের ধারে॥

খোকার ছিলে ঘোড়া, খোকা ছুটতো তোমায় চড়ে।
খেলাপাতি পাত্‌ত খুকি তোমারে ঘর করে।
লুকিয়ে নভেল টেবিল-তলে   যে সব ছাত্র কৌতূহলে
পড়ত, তুমি ছত্র তাদের পড়তে পিঠে জোরে॥

হয়ত নতুন লোকের কাছে সুখেই আছ নিজে,
হায়রে আমি পথে-পথে মরছি ভিজে-ভিজে।
মরছি হেঁচে মরছি কেসে   জানছ না তো, মলিন বেশে
শালিক-সমান কাঁপছে হেথায় তোমার মালিকটি যে॥

হয়ত নেহাত দায়েই পড়ে গিয়েছে কেউ নিয়ে,
বেরোয়নাকো ধরা পড়ার ভয়ে মাথায় দিয়ে।
হয়তো মাকড়শাদের জালে   বন্দী হয়ে ঝুলছ চালে,
আরশুলারা ডিম পেড়েছে তোমার মাঝে গিয়ে॥

নতুন মালিক হয়তো দালাল, নয়তো ভবঘুরে,
নয় উমেদার, সারাটি দিন মরছ ভিজে, পুড়ে।
কেমন আছ নতুন হাতে?   সইবে তো ভাই তোমার ধাতে?
তোমার শোকে প্রাণের সাথী, পরান আমার ঝুরে॥

আহরণী। ২য় সংস্করণ
(দ্বিতীয় খণ্ড)
১৯৩০

কৃষিসংগীত

আজি—সুখের লক্ষ্মীমাসে
শতশত বাঁকি ভরি ঝাঁকা-ঝাঁকি পশারা লইয়া আসে।
ইতুর পাঁচালি, মুঠের মন্ত্রে ডাক শুনে বারবার
এলেন জননী মাঠ হতে, ঘাটে পা-দুটি ধুলেন তাঁর।
দিয়ে নবান্নে করুণা-সুধার প্রথম আস্বাদন,
পিছে-পিছে এলো সারা বছরের সঞ্চয়-করা ধন।
আজি—মসীসেবকের দল,
মসীমাখা মুখে দেখে কিবা কৃষি-লক্ষ্মীর সেবাফল।

আজ—'বাড়িতে আসেনি মা',
হিংসায় কেহ একথা বলিলে মোরা-তো শুনিব না।
বেগুনের ক্ষেতে হেরেছি তাঁহারে শিশুরে স্তন্য দিতে,
দুলিছে 'কাজললতা'গুলি ওই সীমের মাচানটিতে।
হেরেছি তাঁহার কবরী-বিনানো মরায়ের পাকে-পাকে।
বরবটি শুঁটি থোকায়-থোকায়—আঙুল নেড়ে কে ডাকে?
আজ—মা যদি আসেনি রে,
এতদিন পরে ঢেঁকির উপর পাড় দিল তবে কে?

হের—অতসীর গাছে-গাছে
ছেলে ভুলাইতে বাজে ঝুম্‌ঝুমি. নখগুলি ফুটে আছে।
গাঁদাবনে তাঁর সিঁথির সিঁদুর, কুঁদবনে তাঁর শাখা,
হাসে ফুটে খই—আলিপনে ওই চরণ-চিহ্ন আঁকা।
ভরে রাঙা বীজে পুইলতা, চুমি আল্‌তা চরণমূলে,
হিঙুল আঙুলে ক্ষুদের পিটুলি আস্‌কেতে উঠে ফুলে।
আর— বাড়িটির আশে-পাশে—
উড়ে অঞ্চল বায়ু-চঞ্চল শরফুল—বন-কাশে।

আর—আসেনি মা আজ যদি,
বাড়ে কেন এত ভাঁড়ারের পুঁজি, ভাঁড়ে কেন এত দধি?

ভাতে ভরা থালা—খড়ে ভরা পালা, গোলা খালি নাই কারু,
খেজুরের গুড়ে জালাভরা ঘরে, ডালাভরা মুড়ি-লাড়ু।
ভরিয়া উঠান দো-চালা মাচান ধরেছে নানান ফল—
লক্ষ্মীর স্নেহ-মমতার মধু—ইক্ষুতে টলমল।
আজ—মা যদি আসেনি তবে
সারা বছরের সুখের বিধান কেমনে পেলাম সবে?

প্রার্থনা

বৈরী যদি দিতে হয় দাও তবে ভীষ্মসম, ওহে জগদীশ,
যার শরজাল দেয় বক্ষ চিরি পরাজ্ঞান শিরে শুভাশিস।
চাহিনাকো মিত্র আমি সে যদি শকুনিসম চাটু-সুধা মাখি,
সেবন করায়ে নিত্য কুপথ্যের হলাহল মৃত্যু আনে ডাকি।

করগো ভিখারি মোরে সে যদি বিদুরসম চিরতৃপ্ত প্রাণ
মধুর ক্ষুদের লাগি যার দ্বারে ফিরে-ফিরে আসে ভগবান।
করো না নৃপতি মোরে সে যদি যযাতিসম ভোগ-লালসায়,
নিজ জরা-বিনিময়ে পুত্রের তারুণ্য-তরে মরে পিপাসায়।

দাও প্রভু পরাজয় যদি বলি-রাজসম হারায়ে ত্রিলোক,
বামনবটুর পদরেণুতে আঁকিতে পারি ললাট-তিলক।
চাহি না বিজয় তবু সমগ্র ভারতভূমি জিনিয়া সমরে,
স্বজনসন্ততি-হারা কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের সিংহাসন 'পরে।

খর বর্ষা দাও মোরে, কর মেঘবজ্রময় জীবন আমার,
বর্ষণে বিদারি বক্ষ, আনে যেন কমলার আশিস-সম্ভার।
চাহি না ফাল্গুন-ফল্গু ফুল-দল-কিশলয়ে অলস-সুন্দর,
সে যদি স্বপন ভাঙি নিয়ে আসে বৈশাখের ব্যথিত মর্মর।

পরিণতি

বসন্তে অশোককুঞ্জে মিলন তরুণ,
জীবনে হোলির দিন, সকলি অরুণ
গ্রীষ্ম এল। ঝঞ্ঝাহত ত্রস্ত বেশবাস,
ঢেকে দিল মোরে তব স্রস্ত কেশপাশ।
বাসনার বহ্নিতাপে স্বিন্ন দেহমন,
আলসে লুলিত খিন্ন ও কুঞ্জ-ভবন।
সহসা প্রেমের উষ্মা হল বাষ্পঘন,
মঞ্জীর-শিঞ্জন হল কঙ্কণের ক্বণ।
জীবন-প্রাবৃটে সখি কত ছল-ভান,
অকারণ বরিষণ কত অভিমান।
সে সব গিয়াছে দূরে আজি তোমা, সখি
ভবন-জ্যোৎস্নার রূপে শরতে নিরখি।
তুলসী-মাধবী-কুঞ্জ অলিন্দ-অঙ্গনে
আলোকিত করে আছ, অয়ি স্মিতাননে।

সনাতনী

অন্নপূর্ণা তব করে ভিক্ষা লভিবারে,
সাধ করে হইয়াছি শাশ্বত ভিখারি।
যাচিয়া লয়েছি কণ্ঠে অনন্ত তৃষারে,
লভিবারে তব প্রেম-ঝরনার বারি।
তোমার অঞ্চল-স্নেহ লভিতে, নয়ন
হয়ে আছে যুগে-যুগে অশ্রুর নিলয়।
ব্যাধিরে করেছি সাধি এ দেহে বরণ,
তব কর-কিশলয়ে হতে নিরাময়।
মধুবাণী শুনিবারে করি অভিমান,
মমতা লভিতে করি বিরহ-সৃজন,
শয়নে নয়নে শুধু করি নিদ্রা-ভান,
জাগিয়া উঠিতে তব লভিয়া চুম্বন।
ঝরাইতে অশ্রুবারি তোমার নয়নে,
জনমে-জনমে আমি বরি যে মরণে।

প্রাক্তনী

কতবার স্বয়ংবর-সভা উপেক্ষিয়া,
এ কাঙাল কণ্ঠে তব দেছ বরমালা।
ঘুরিয়াছ বনে-বনে আমার লাগিয়া,
কতবার সাজায়েছ বরণের ডালা।
কতবার রাখিয়াছ সতীতেজোগুণে,
শমনের দণ্ড হতে আমার জীবন।
কতবার সাজায়েছ তরবার-তূণে,
রথ-রশ্মি শতবার করেছ ধারণ।
নতুবা সহজ সবি হইল কেমনে?
কিছুই তোমার যেন নহেকো নূতন।
কোথা পেলে? কই? কিছু শেখনি জীবনে।
সবি চিরপরিচিত প্রবুদ্ধ প্রাক্তন।
কোন আদিকাল হতে আছ মোর সাথে,
জন্ম হতে জন্মান্তরে মানস-সন্তাতে।

রূপময়ী

তুমি মোর আঁখিতারা, তুমি মোর আলো.
তুমি মোর ক্লিষ্টক্লান্তদৃষ্টি-সঞ্জীবন।
এই বিশ্বখানি মোর লাগে বড় ভালো
তোমার স্বচ্ছতা ভেদি নেহারি যখন।
আপনারে দেখাইলে মহাবিদ্যা-সাজে,
বিশ্বময় যত স্বপ্ন মূর্তি ধরি নাচে,
সব মায়া ভাব-রস-রূপ হয়ে রাজে,
সব মন্ত্রগুলি যেন ঘুরে কাছে-কাছে।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-দীপ-খদ্যোতিকা,
মাণিক্য-ওষধি-রশ্মি গড়েছে তোমায়।
শত জনমের মোর স্বপ্ন-নীহারিকা,
কেন্দ্রীভূত পুঞ্জীভূত তব প্রতিমায়।
মুদ্গারের মোহ তুমি বেদান্তের মায়া,
মোর নেত্রে একমাত্র সত্যময়ী কায়া।

রসময়ী

আনন্দ-মদিরা তুমি নিত্য রসায়ন,
তোমারে পিইয়া মোরা চিত্ত ঢুলু-ঢুলু।
রসের নির্ঝর, লভি তোমার জীবন
আমার জীবন-নদী বহে কুলু-কুলু।
তব প্রেমমধুগঙ্গা এল কি ধরায়
রসরাজ-পাদপদ্মে জনম লভিয়া?
সুধাসিন্ধুসমুত্থিত মন্দারের গায়
তোমার অঙ্গুলিগুলি ফুটিল কি প্রিয়া?
সাম্মিলিত সপ্তবর্ণ পরিণত রসে,
সৃজিল তোমার শুভ্র গোরস-হৃদয়।
রক্তিম আনন্দ-হাস্যে অধর বরষে,
চন্দ্রবিম্বে যেন স্ফুট রক্তাম্বুজচয়।
ইহেরে করেছ প্রিয়ে স্পৃহণীয়তম,
জীবনে করেছ ঘন চুম্বনের-সম।

দেহাহিত

বলেছেন ভর্তৃহরি নারীর যৌবন
অস্থি-মাংস-মজ্জামেদ ক্লেদের মিলন।
এ সবের অন্তরালে কিছু নাই হায়!
মিথ্যা কথা! অন্তরাত্মা নাহি দেয় সায়।
দেবতা জাগ্রত যদি না রহে দেউলে,
কে জাগিবে নিশিদিন সোপানের মূলে?
সুন্দরে মিলে না 'বলি বুকে বুক দিয়া
লাখ-লাখ যুগ ধরি, জুড়ায় না হিয়া।'
অরূপে মিলে না বলি 'নাই তিরপতি
জনম অবধি রূপ নেহারিয়া নিতি।'
বাঁশরি বাজায়ে কানু কোথায় লুকায়,
আমরা ঢুঁড়িয়া ফিরি ঝোপে-ঝাড়ে তায়।
মানি না কণ্টক-ক্লেদ অমেধ্য পল্বল,
শ্যামের সন্ধান সবি করেছে নির্মল।

দেহাতীত

বাঁশরি শুনেছি, তায় দেখিনিকো চোখে,
তুমি প্রিয়া তার সাথে মিলনের দূতী,
এ লোক হইতে নিয়ে যাও অন্যলোকে
ওগো স্বাহা, জীবনের সকল আহুতি।
তোমারে সকলি সঁপি নিরুদ্বেগ আমি,
জনমিল পূর্বরাগ তোমারি কৃপায়,
মম নিবেদিত অর্ঘ্য তুমি দিবা-যামী,
বহিছ গোপন পথে সে প্রভুর পায়।
তুমি যদি মোর প্রেম না কর বহন,
একেবারে তাঁর কাছে দাঁড়াব কেমনে?
লজ্জায়-কুণ্ঠায় প্রেম হইবে স্বপন,
অভিসার-পন্থা যদি না দেখাও বনে।
তোমারে বিরাগী কবি বলে ঘৃণ্য? হায়!
দেব-দেউলের সিঁড়ি ভাঙিবারে চায়?

আর্যাবর্ত

'নিম্নে' অই মহাসিন্ধু সর্বরত্ন-খনি,
বরুণের কোষাগার লক্ষ্মীর নিবাস,
ঐহিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির আশ্বাস,
অনন্তের শীর্ষে যথা জ্বলে কোটি মণি।
'ঊর্ধ্বে' অই ভারতের দৃষ্টি সনাতনী।
হিমাদ্রির শৃঙ্গরূপে বিদরে আকাশ,
নামে তাহে পুণ্য ব্রহ্মধারা বারোমাস,
অই মন্দাকিনী শুভ ধ্রুবের জননী,
মহাযোগ-ধারা, এই ভস্ম-সঞ্জীবনী
স্বর্গে-মর্ত্যে, অনিত্যে ও নিত্যসত্তা-সনে,
শ্রেয়ে-প্রেয়ে, গৌরী-হরে, লক্ষ্মী-নারায়ণে,
শক্তি-কর্মে, ভক্তি-জ্ঞানে যোগ-সম্মিলনী।
ইহ-পরত্রের মহা মিলন-নিলয়
এই আর্যাবর্তে সর্ব দ্বন্দ্ব-সমন্বয়!

পল্লী-শ্রী

নৌকাখানি ভিড়িয়াছে একটি গ্রামের কাছে,
মাঝি গেছে কাঠের সন্ধানে,
আমি উঠি নদীতীরে হেরি ওই গ্রামটিরে
মায়ামুগ্ধ আয়ত নয়ানে।
পথখানি জল থেকে চলিয়াছে এঁকে-বেঁকে,
আম্রবন হইয়াছে পার,
ঘট কাঁখে আসে বধূ, নব-মুকুলের মধু
বিন্দু-বিন্দু ঠোঁটে পড়ে তার।
পাকুড়ে বাদুড় ঝোলে, তালগাছ হতে দোলে
সারি সারি বাবুয়ের বাসা,
কোথায় বাতাবি ফুল গন্ধে বন মশ্‌গুল,
হেথা হতে তৃপ্ত হয় নাসা।
যতদূর দৃষ্টি ধায়, নয়ন জুড়ায়ে যায়
তরঙ্গিত শ্যামল উচ্ছ্বাস,
শ্যামলীর সিঁথি 'পরে সিন্দুর লেপন করে
মাঝে-মাঝে শিমুল-পলাশ।
শুধু ছায়া, শুধু ছায়া আধা আলোকের মায়া-
উঠে ধূম খড়ো চাল ভেদি ;
দেখা যায় দুটি গোলা কূয়া হতে জলতোলা,
বেড়াখানি রচেছে মেহেদি।
কামার পেটায় লোহা, দেখি দূরে দুধ দোহা,
ডোমের মেয়েরা বুনে ঝুড়ি,
বটচ্ছায়ে ধেনুগণ করে সুখে রোমন্থন
গোবর কুড়ায়ে যায় বুড়ি।
শুকায় শোলার ভেলা জালগুলি আছে মেলা
নিম ডাল হতে পড়ে ঝুলি,
সারিবাঁধা নদীতটে খেজুর গাছের ঘটে,
আসে-যায় মধুমক্ষীগুলি।

মন্দিরের ধাপে-ধাপে আল্‌তার দ্যুতি কাঁপে,
পূজা দিতে জননীরা আসে ;
দড়া বাঁধি আমগাছে ছেলেরা দোলায় নাচে,
ভয়ে মুখ ম্লান, তবু হাসে।
রসতৃপ্ত পাখি সব অবিশ্রান্ত কলরব
করিতেছে কুলায়ে-কুলায়ে।
বায়ু বয় ঝিরি-ঝিরি শ্রান্তি হরি ধীরি-ধীরি
রাখালের নয়ন ঢুলায়ে।
মনে হয় এতোদিনে বসতি ফেলেছি চিনে।
ধন্য হই, এই নদীতীরে
জীবন কাটায়ে দিতে পারি যদি এ নিভৃতে
ছায়াচ্ছন্ন একটি কুটিরে ;
তরীযাত্রা হয় শেষ শান্ত হয় সব ক্লেশ,
বন্ধ হয় সকল সন্ধান,
নগরের কলরোলে ক্লান্ত হয়ে, মার কোলে
ফিরে আসে মায়ের সন্তান॥

তত্ত্ব ও রস

ও ফুল কালই যাবে ঝরে, হাস্‌বেনাকো হেন,
তাই বলে হায় ও ভাই কবি, দুঃখ কর কেন?
দুইটি দিনের প্রজাপতি, তিনটি দিনের অলি
শোক করো না, ফুলের সাথেই মরবে তারা বলি।
মরণ-লীলার তলে-তলে অমরতার ধারা
দেখ্‌বেনাকো? দেখ্‌বে তবে হায় কে তুমি ছাড়া?
ফুলের বুকে অমৃত যে সংগোপনে জাগে,
ফুল যে রঙিন শোভায় হাসে অমর অনুরাগে।
গন্ধ তাহার কয় কাননে, শাশ্বতী সে বাণী ;
মৃত্যুজয়ের ব্রতে তা সব ভৃঙ্গে আনি টানি।
জুটে কি অই পতঙ্গেরা অযথা তার পাশে?
রঙিন পাখায় অমরতার বীজ বয়ে সে আসে।
মধুকোষের সূক্ষ্ম পথে অনেক ব্যথাই সহি।
ভৃঙ্গ পশে সৃষ্টি-দেবীর নিদেশ শিরে বহি।
প্রজাপতির ঘটকালিতে পুষ্প-পরিণয়,
ফুলের প্রণয়স্পর্শে ফলের বীজেও প্রাণময়।

জাগে জীবন-ডোরটি হরের হাড়ের হারের মাঝে।
মরণ-লীলার মাঝে তাদের হ্রস্ব জীবনটুক
চিত্তলোকেও অমর হতে সতত উন্মুখ।
শিল্পী তারে অজর করো চিত্রটি তার আঁকো,
শোক করো না, ছন্দে কবি অমর করে রাখ।

"সবই বুঝি তত্ত্বজ্ঞানী ভাই,
সজল চোখেই তবু আমার ফুলের পানেই চাই।
সত্য যা তা বুদ্ধি বোঝে, হৃদয় বোঝে কই?
ব্যথার অকূল পাথারে ভাই পায় না সে যে থই?
গীতায় প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানী বৈরাগীটির চোখে,
অশ্রু কি আর ঝরে না ভাই প্রিয়জনের শোকে?
ফুলের জীবন রইবে বেঁচে আঁখির অন্তরালে,
আঁখি যা তায় হারায় তাহার তরেই ধারা ঢালে।
কি দোষ দেব নয়নেরে? বঞ্চিত সে হায়,
ফুলের অমন অমরতায় তার কি আসে যায়?
অমরতাই নয়কো বড় অই চাহনি হাসি,
পাতার দোলায় ঐ যে দোলন বড়ই ভালোবাসি।
ওই গ্রীবাটির ভঙ্গি-সোহাগ, সুরভি নিশ্বাস,
দেবে কি আর ফিরিয়ে তোমার কথাতে বিশ্বাস?
ফিরবে সবি? এটাই তবে শেষ কাঁদা নয় হায়?
বারংবারই কাঁদতে হবে ফুলের বেদনায়?"

অকালের পাখি

ওরে মূঢ় বসন্তের পাখি,
আজি এ বর্ষার রাতে কেন তুই ডাকিস্ একাকী।
কোথা নব কিশলয়, কোথা জম্বু-রসাল-মুকুল?
কোথায় মলয় বায়ে শ্লথ আলোছায়ার দুকূল?
মানুষের ভালোবাসা তারো ভাই কত আয়োজন,
কে জানে কে তার প্রিয়? বেষ্টিত,—না তার আবেষ্টন?
বিবাহ-নিশায় বর শোভে যেন রাজার কোঙর।
অন্যদিনে দিবালোকে সে তো শুধু কাহারো কিঙ্কর?

সঙ্গে তুমি আনো নাই ফাল্গুনের সেই আবেষ্টন।
অঙ্গে তুমি আনো নাই অনঙ্গের সেই পরশন,
পাখোয়াজ বাজে হেথা কে শুনিবে ঠুংরির ঝঙ্কার?
মল্লার-সভায় আজ কে শুনিবে বসন্ত বাহার?
কাফিসিন্ধু জমিবে কি ইন্দুহারা মেঘসিন্ধু-তীরে?
কে শুনিবে একতারা ঢাক-বাজা রথযাত্রা ভিড়ে?
মিছে ফিরাইতে চাস্ এ দুর্দিনে বসন্ত-মাধুরী,
তার-স্বরে ডুবাবে তা পঙ্কবাসী হাজার দাদুরী।
বলির রুধিরে আজ নিভে গেছে মাধুর্যের ধূপ,
তমোমগ্ন বিশ্বে আজি খুঁজে লোক ঘটা ছটা-রূপ।
তাই আজি পুচ্ছসার নটশিখী লভেছে আদর,
কুহুর গিয়াছে দিন কেকা আজ কাঁপায় অম্বর।
মিছে আজি তোর ডাকাডাকি,
শুধু দন্ত কেশ নয়, স্থানভ্রষ্ট নাহি শোভে পাখি।

শরতের গ্রামপথে

খালি পায়ে আলি-পথে চলিয়াছি দ্রুত,
জন্মভূমি জননীর স্নেহ-সম্ভাষণখানি হয় অনুভূত।
দু-ধারে ধানের শীষ নুয়ে-নুয়ে, লীলাভরে করে পথরোধ,
ঠেলিয়া চলিতে গায় কোমল পরশ পাই, হয় সুখবোধ।
মেঠো পুকুরের কোণে ঢেউ খেলে কাশবনে, জাগে বাল্যস্মৃতি,
অমনি দুধের ঢেউয়ে দুলিয়া শুনেছি ঘুম-পাড়ানিয়া গীতি।

চিকণ ধানের ক্ষেতে শরতের রোদখানি পিছলিয়া পড়ে,
ছাতিম-তলাটি দিয়ে যাইতে মাথার 'পরে ফুলদল ঝরে।
বাঁ-পাশে গাঁয়ের বিল ফুটে আছে থরে-থরে কুমুদ-কমল,
উড়ে ঘুরে শঙ্খচিল, সহসা 'নবীন' জেলে শুধায় কুশল।
চলিয়াছি বার-বার অঙ্গে লভি ভেরেণ্ডার কোমল পরশ,
হাতে দুটি শরফুল তারা যেন এ মনের ফুটন্ত হরষ।

কেয়াপাতা-কিনারায় শেয়াকুলডালে গায় কত লাগে ছড়,
ব্যথালেশ নেই তায়, যেন কচি শিশুটির নখের আঁচড়।
মুখ-বাঁধা গোরুগুলি চলিয়াছে পর-পর চকিত-চাহনি,
ক্ষেতে নামি তাড়াতাড়ি তাহাদের পথ ছাড়ি দিলাম তখনি।

কইমাছ কানে হেঁটে এসেছিল নালী ছেড়ে পলায় পিছলি,
কাঁকড়া পথের 'পরে নির্ভয়ে বিরাজ করে, বাঁচাইয়া চলি।
সাপ গেছে দাগ এঁকে গায়ের খোলস রেখে পথের উপর,
শামুক বিথারি মুখ নীরবে ধরিছে শুয়ে ঘাসের মাকড়।
জালি-কাঁধে জেলেনীরা ক্ষেতে নামি দিল পথ ছাড়িয়া সম্ভ্রমে,
দেহে শাড়ি টানা-টানি লাজে তবু মুখখানি ঢাকে কোনক্রমে।

মাঝে-মাঝে জল-কাদা তাপিত পদের ক্লান্তি করিছে হরণ,
দুই পাশে ঘন ঘাসে শিশিরকণারা হাসে, ধোওয়ায় চরণ।
বাঁ-দিকে আখের ক্ষেত শ্যামঘনবন হয়ে ঢাকিয়াছে নালী,
তার মাঝ হতে উড়ে মধুর সাহানা সুরে দাশুর পাঁচালী।

সম্মুখে গ্রামের দীঘি কঙ্কণ-ঝঙ্কৃত-কলকলস-চঞ্চল,
মাছরাঙা, চখাচখী, হাঁস-বক, সখা-সখী করে কোলাহল।
হেথা হতে পাই মার মমতা শেফালিকার মধুরসৌরভে,
প্রীতিভরা আমন্ত্রণী গীতিভরা আপ্যায়নী শানায়ের রবে।

একে-একে চেনা মুখ পুলকি তুলিছে বুক, একান্ত আপন
সবি মোর ; চারিধারে স্নেহভরা কৌতূহল, সাদর ভাষণ।
মা বলিয়া কে ডাকিল? ও-যে চিরচেনাগলা, চোখে আসে জল
সুখস্বপ্নে করে ভোর, সর্ব-অঙ্গ করে মোর রোমাঞ্চ -চঞ্চল।

ছায়া

ছেড়ে যেতে চাহি পিছু পানে।
পথপাশে ছায়াখানি দিয়া যেন হাতছানি
ডাকে ফিরে, দেহ মোর টানে।
রৌদ্রতাপ-বিগলিত স্নেহরস সুললিত
গড়ায়ে ঘিরেছে তরুতল,
ঘনপর্ণ-শ্যামলিমা দেছে তারে মধুরিমা
বায়ু তারে করেছে শীতল।
দেহ আগে যায় যত, প্রাণ পিছু হাঁটে ততো,
অই ছায়াখানির মায়ায়,
দু-দণ্ড তাহার ক্রোড় জুড়াইল প্রাণ মোর
এলায়ে পড়িল মোর কায়।

যেন রাজ-শয্যা 'পরে মধ্যাহ্ন-শ্রান্তির ভরে
কৃষাণ ঘুমায়ে আছে হোথা,
পশারী পশরা থুয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে শুয়ে
কোথা গঞ্জ? গৃহ তার কোথা?

রাখাল বাজায় বেণু, চক্ষু মুদি তার ধেনু
তৃপ্তি-সুখে করে রোমন্থন,
বিগলিয়া পড়ে স্নেহ ছাগলী শাবক-দেহ
ধীরে-ধীরে করিছে লেহন।
মধুর তন্দ্রার সুখে কুকুরটি হোথা ধুঁকে,
পাশে বেজি নিদ্রায় বিভোর,
বটফলে তৃপ্যমাণ বিহগের কলতান
ঘনায় সবার ঘুমঘোর।
শিবিকা-বাহীরা সব শুনি সেই কলরব
একে-একে ঘুমে নিমগন,
নব-বধূ মুদি আঁখি সুখে-দুখে মাখামাখি
এলোমেলো হেরিছে স্বপন।

স্নেহের অঞ্চলখানি মাটিতে বিছানো জানি
অইখানে দুপুর বেলায়,
মায়ের সকল ছেলে সব কাজ খেলা ফেলে
জুটে শ্রান্ত শরীর এলায়।
ক্ষণেকের ও-সংসার ছেড়ে যেতে বার-বার
পিছু পানে চাই থেকে-থেকে
পাখিদের কলস্বর ক্রমে হয় ক্ষীণতর,
শ্রান্ত তারা বুঝি পিছু ডেকে।
আগে পথ করে ধূ-ধূ, পঙ্গু হয় গতি শুধু
বার-বার চাহিয়া পশ্চাতে,
ছায়াখানি পড়ে রয় তারে ছেড়ে যেতে হয়,
ব্যথা শুধু চলে সাথে-সাথে।

যৌবন-বিদায়

জানি তুমি যাবে, ধরিয়া তোমারে যায় না রাখা,
এতো তাড়াতাড়ি তবু যাবে ছাড়ি ভাবিনি ভুলে।
অসীমের পানে উড়িতে গগনে মেলেছ পাখা,
অশ্রু বৃথাই করে থই-থই এ আঁখি-কূলে।
শুরু করেছিনু জীবন-যাত্রা যাদের সাথে,
এখনো তারা যে নিতি নব-সাজে আমোদে মাতে।
শীতল ও-হাত রাখিলে সহসা আমারি হাতে,
বিদায়ের কথা একদা নিভৃতে বলিলে খুলে।
দেরি হয়ে গেল আয়োজনে মোর জীবন-প্রাতে,
বহু বাকি তাই, তবু আঁখি ভাই পড়িল ঢুলে॥

ঝরে যায় ফুল, মধুকরকুল সময় বুঝে
মৌচাক ছাড়ি একে-একে দূরে উড়িয়া যায়।
কোকিলকণ্ঠে সে কাকলি আর পাই না খুঁজে,
জোছনা-মলয়ে এ দেহ এখন পুড়িয়া যায়।
মুখের মশানে দশনের পাঁতি পড়ে যে ঝরে,
তুষারে-তুষারে গেল যে আমার এ শির ভরে,
এসেছিল ঢল, ভাটি-টানে জল আসে যে মরে,
আত্মা আমার দেহের নিকটে হিসাব চায়।
দেনার তাগিদে ব্যাধিরা দুয়ার নাড়ে যে জোরে,
প্রিয়ার আদরে সে মাধুরী আর মিলে না হায়॥

যাবে চলে চোর, কত কথা মোর হয়নি বলা,
কত কাজ আমি করিয়াছি শুরু, হয়নি সারা।
গেল যে সময় তন্ত্রী বাঁধিতে সাধিতে গলা,
কত গান গাওয়া হল না, অগীত রহিল তারা।
কত আশা মোর মুকুলে মুদিত ফুটেনি ফুলে,
কত কল্পনা এখনো স্বপনে গোপনে বুলে।

পিয়াসা এখনো জ্বলিছে আমার কণ্ঠমূলে,
তুমি নিয়ে যাবে ভৃঙ্গারভরা পানীয়ধারা।
হরিলে শকতি, পৌরুষ, মতি কর্মফলা,
জীবনের গুরুভার শিরে এবে রবো কি খাড়া?

কাঙালের গেহে অতিথি হইয়া পেয়েছ হেলা,
রাখিতে পারিনি তোমারে এ দেহে সগৌরবে,
মধুমাসে তব জমাতে পারিনি মোহনমেলা,
মাতিতে পারিনি প্রাণ খুলে তব রসোৎসবে।
কমলাভারতী-ইন্দ্রাণী-রতিপূজায় তব,
জোগাতে পারিনি ষোড়শোপচার নিত্য-নব।
কত ছিল দাবি, তাই মনে ভাবি, কতই কব?
তোমারে তুষিতে ভূষায় ভূষিতে পেরেছি কবে?
না হতে সময় তাই কি অতিথি ভাঙিয়া খেলা,
নিদয় হৃদয়ে এ দেহ হইতে বিদায় লবে?

দিয়াছিলে যাহা সবি আজি তাহা লইলে লুটে,
দাও নাই যাহা তাও নিলে স্নায়ুবাঁধন খুলি।
ফুল ঝরে যায়, ফল রয়ে যায় বৃন্তপুটে।
কি ফল রাখিলে? বিফল ফুলের পরাগধূলি?
শ্লথ বাহুপাশ ভাঙা গলা শুধু রেখেছ বাকি,
আশাহীন বুক, হাসিহীন মুখ, অরুণ আঁখি।
খাঁচাটি রাখিয়া সাথে নিয়ে গেলে প্রেমের পাখি,
রঙ নিয়ে গেলে রেখে গেলে শুধু শুষ্ক তুলি।
দেখ পিছু ফিরে এ দেহ-কুটিরে কি গেলে রাখি—
পঙ্গু লেখনী, হৃদঘন মসী, স্মৃতির ঝুলি!

তুমি যাবে জানি মরণেরে টানি আনিয়া দিতে,
এ বিদায়ে তাই তারি আগমনী গাহিতে হয়।
তুমি এলে সব দিয়ে-থুয়ে শেষে হরিয়া নিতে,
নিঃস্বের কভু বিশ্বে তো নাই দস্যু-ভয়।
তুমি চলে গেলে জীবনের সার মাধুরী হরে,
সে আসে আসুক তার ভয়ে আর রবো না মরে।
তোমার মতন একলা ফেলে সে যাবে না সরে,
সাথে নিয়ে যাবে, জরা-যন্ত্রণা করিয়া ক্ষয় ;
তুমি দিলে জরা ; নবীন জীবন সে দিবে মোরে,
তোমার মতন মরণ এমন নিঠুর নয়॥

বিদ্যালয়-পথে

বাবলা ফুলের গন্ধে সেই পথখানি পড়ে মনে
যেই শীর্ণ পথ ধরি চলিতাম কৈশোর-জীবনে
বিদ্যালয়-পানে নিত্য। রাঙচিতা-বেড়া দিয়া ঘেরা
মাঝে মাঝে ছোট-ছোট কুটির-অঙ্গনে বালকেরা
করিতেছে ছুটাছুটি। মা তাদের ব্যস্ত নানা কাজে।
জীর্ণ দরগার তলে চক্ষু মুদি নিমগ্ন নামাজে
সারি-সারি কতজন। বাজে শঙ্খ শিবের মন্দিরে,
বিরাট মন্দির জীর্ণ, ঊর্ধ্বে উঠে বটধ্বজা শিরে ;
বিশ্বনাথ মুষ্টিভিক্ষা লভে নিঃস্ব সেবকের হাতে।
ওলন্দাজি গোরস্তান উপবন পুষ্পের শোভাতে।
বিদেশি বণিকগণ এসেছিল হতে বসুপতি,
বসুমতী-অঙ্কে সেথা লভিয়াছে সুপ্তির সদ্‌গতি।
ডাহিনে বিলের জলে ফুটে আছে কুমুদ-কমল,
বাঁয়ে বেণুকুঞ্জগুলি বায়ুভরে করে টলমল।
হাপরে ফেলিছে শ্বাস কামারের ছোট্ট কারখানা ;
বকুলতলায় ছিল কতদিন বেদের আস্তানা
পড়ে আছে পোড়া কাঠ। বাজে ঘণ্টা আর্মানি গির্জায়
স্থবির যাজক এসে ধীরে-ধীরে তোরণে দাঁড়ায়
শুধায় কুশল-প্রশ্ন। গির্জা আছে, ভক্ত আর নাই,
নির্মূল ইহুদিকুল পুরোহিত আজিকে একাই
শুনিছে কালের ঘণ্টা। ঘটে-ঘটে ক্ষরিছে জীবন
খর্জুর-তরুর কণ্ঠে। তালীবনে দুলায় পবন
বাবুয়ের বাসাগুলি। খণ্ড-খণ্ড এমনি কতই
চিত্র নিয়ে বনপথ মনে মোর জাগিছে স্বতই॥
কণ্ঠে মোর দিল ভাষা বিদ্যামঠ, শুনাইল, মোরে
দেশবিদেশের বাণী, মোর রিক্ত ঝুলিখানি ভরে
পাথেয় সম্বল দিল, বারবার তারে নমস্কার।
আর অই বনপথ জাগাইল জীবনে আমার
আশা, তৃষা, রসাবেশ, গাঢ়প্রীতি, গূঢ় অনুভূতি,
কল্পনারে দিল মুক্তি, ক্ষিপ্র গতি, গভীর আকুতি,
শিখাইল লীলাভঙ্গি। ভুলিব না তারে ভুলিব না,
শ্রমক্লান্ত-তাপদগ্ধ এ জীবনে সঁপিছে সান্ত্বনা
আজিও তাহারি দান। জাগাইল মনের অনুতে
নব-নেত্র, নব-শ্রুতি, এ দেহের অণুতে-অণুতে

ফুটাইল রসাঙ্কুর। ভুলিব না কভু ভুলিব না,
ছায়ার অঞ্চল দিয়া মুছাত সে সকল বেদনা,
পাঠক্লান্তি, স্বেদ, শ্রান্তি, ঘুচাত সে মালিন্যের ভার,
জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে সে সোহাগ তার।
জীবনের সরসাংশ অই পথে রয়েছে জড়ানো
মুকুলিত জীবনের রেণুগুলি রয়েছে ছড়ানো
ও পথের ধূলি-মাঝে। কী বাঁধন ছিল যে নিবিড়
ও পথের প্রতি তরু-গুল্ম সাথে! প্রতিটি কুটির
ছিল মোর পরিচিত। তরুশাখা হতে লতাগুলি
বাড়ায়ে পেলব বাহু শুধাইত পথটি আগুলি
পুষ্পিত-কুশল-বাণী। কৈশোরের মধুস্বপ্নে ভোর
জীবনে জীবন্ত আজি ছায়াঘন সব মায়া-ডোর
তাদের স্মৃতির সাথে। কবে কার পল্লব তরুণ
হল পুষ্ট ঘনশ্যাম, কবে কার মঞ্জরী অরুণ
হল ফলে পরিণত ;—জানিতাম। বুকে আছে আঁকা
বৈশাখী ঝঞ্ঝায় কার কবে হায় ভেঙেছিল শাখা॥
সব চেয়ে মনে পড়ে ফাল্গুনের অপরাহ্ণগুলি
উদ্ধত বাদাম-তরু উচ্চাকাশে রক্তকেতু তুলি
দাঁড়াইয়া জয়গর্বে ; অন্য পাশে বিশাল শিমুল
সর্বটুকু বক্ষোরক্ত নিঙাড়িয়া ফুটাইয়া ফুল
অর্ঘ্য সঁপে উদঞ্জলি। তার মাঝ দিয়া পথখানি
আম্রকুঞ্জতলে মোরে স্নেহভরে নিয়ে যেত টানি
মুকুলিত শাখা হতে যেথা বিন্দু-বিন্দু মধু ক্ষরি
পড়িত আমার ঠোঁটে—উঠিতাম সহসা শিহরি
অতর্কিত কুহুতানে। মনে হত, কি যেন কি নাই
কি যেন হারিয়ে গেছে, ছিল মোর। কারে যেন চাই,
সবি যেন স্বপ্ন-মায়া। চিত্ত মোর দেশকাল-হারা
কোকিলের কণ্ঠে পেয়ে যেন কোন্ অজানার সাড়া
ছুটিত অনন্ত-পানে। বৈশাখের প্রশান্ত প্রভাতে
এক হাতে গ্রন্থভার, চম্পাহার লয়ে অন্য হাতে
চলিতাম ঘ্রাণমুগ্ধ গেয়ে গান দলিয়া বকুল,
সুরভি শীতল বায়ু অন্তরেও ফুটাত মুকুল,
সর্বদেহে রোমাঞ্চুর। ক্লিষ্ট যবে রবিকরজালে
মাতৃ-মমতার মতো ছায়াখানি ফিরিবার কালে
লভিতাম তপ্ত ভালে। কৈশোরের কত মুগ্ধ আশা
ওপথের দুইপাশে গাছে-গাছে বেঁধেছিল বাসা,

ধুলায় লুটায় আজ। জানে—জানে অই পথখানি
জীবনের গূঢ় তথ্য। কৈশোরের অকথিত বাণী
ওপথের দুই পাশে পাখিদের কলকণ্ঠ ভরি
রাখিয়া এসেছি আমি। দুইধারে তৃণের মঞ্জরী
সিক্ত মোর আঁখিজলে। কাঁদিবার নিভৃত সুযোগ
দিয়েছিল এই পথ, সে কৈশোরে কত দুঃখভোগ
করিয়াছি, জানিত সে। মোর সুখদুঃখ তার গায়
রেখেছে বিচিত্র করি আজো আলো-আঁধারি লীলায়
ধুলায়-কাদায়-তৃণে। মোর যত অতৃপ্ত কামনা
আজো সেথা ঝিল্লিতানে নিশিদিন করিছে শোচনা
দরদীর প্রতীক্ষায়। তারুণ্যের সোনার স্বপন
সোঁদালের ডালে-ডালে হয়ে আছে পুষ্পিত কাঞ্চন॥

গোপী-যন্ত্র

তব সংগীতে সহজিয়া মিতে, শুনি বঙ্গের মর্ম-বাণী,
বিগলিত তার তরল ললিত মুগ্ধ-সরল হৃদয়খানি।
গেরুয়া মাঠের উদাস আকাশ, শ্যাম দিগন্ত, বটের ছায়া
তোমার অঙ্গে সুর-তরঙ্গে রচেছে মোহন-মদির মায়া।

তব গীতি শুনে জেগে উঠে মনে কত জনমের কত না স্মৃতি,
যুগে-যুগে কত শ্যামলা মায়ের লভেছি নিবিড়-গভীর প্রীতি।
ফিরে যায় মন নরহরি আর নরোত্তমের প্রেমের হাটে,
ফিরে যায় মোর মনের লোচন সাধক লোচনদাসের পাটে।
সরে যায় মোর নয়ন হইতে পুর-নগরের বিদেশি ঘটা.
মৃত রাজপথ, বিজাতীয় রথ সৌধ-সৌদামিনীর ছটা।
যতিরা যাহারে খুঁজে জপে-তপে, ব্রতীরা যাহারে গ্রন্থে খুঁজে,
মঠে-মন্দিরে বহু ঘটা করে গৃহী ঘটে-পটে যাহারে পুজে,
তুমি তার কানে-কানে কথা কও অন্তরঙ্গ মিতার মতো,
হাসে রসরাজ দেখিয়া তাদের নিলাজ-ব্যর্থ প্রয়াস যত।
তুমি যারে পেলে নেচে-হেসে-খেলে চলে সে সহজ সরল-পথে
জানো তার দেখা মিলেনাকো সখা, গজরাজি-পোত-বিমান-রথে।
সব বাঁধনের বাহিরে যে রাজে তার রহস্য জেনেছ একা,
ধূলিকাদামাখা মেঠো পথে সখা ব্রজরাখালের পেয়েছ দেখা।

সোনা ফেলে যত মূঢ় মোহহত শূন্য আঁচলে দিয়েছে গেরো,
সেই সোনা পথে কুড়ায়ে পেয়েছ, উল্লাসে তাই নাচিয়া ফেরো!
সর্ব-বন্ধ-মুক্তির বাণী, বন্ধু, তোমার মরমে বাজে,
হয়ে যায় শ্লথ শৃঙ্খল যত—এ উদাস মন লাগে না কাজে।
মনে হয় আহা হারায়েছি যাহা তার কাছে যেন তুচ্ছ সবি,
তুমি তাহা খুঁজি পাইয়াছ বুঝি তব ঝঙ্কারে আভাস লভি!

পরমানন্দ-ভুবনের পথ মনে হয় যেন তুমিই জানো,
তাই বুঝি নিতি গাহি নবগীতি কাজ হতে হেন অকাজে টানো।
তাই বুঝি মন হয় উচাটন, অজানা বিরহে গুমরে বুক,
সব আয়োজনে মায়া ভাবি মনে, সুখের মাঝেও পাই না সুখ।
ভুলের ধাঁধায় আমারে কাঁদায় যেন মনে ভায় সকলি মিছে,
সত্যের খোঁজ পাইব হয়তো ধাই যদি মিতা তোমার পিছে॥

বৈশ্বানর

বিশ্বনরের আত্মস্বরূপ প্রণমি তোমারে হব্যবহ,
সপ্ত রসনা অঞ্জলি-পুটে মম বাঙ্ময় হব্য লহ।
হে গূঢ় পুরুষ, হও এ মূঢ়ের ধ্যানের নয়নে পরিস্ফুট,
মর্মেন্ধনে বন্ধন দহি আমাব ছন্দে জ্বলিয়া উঠ।

জ্বলিতেছ তুমি ত্রিলোচন-ভালে স্মর-লীলামদ শান্ত করি
জ্বলিতেছ তুমি ভর্গের রূপে দ্যাবাপৃথিবীর ধ্বান্ত হরি।
শতমন্যুর দশশত চোখে জ্বলিতেছ তুমি সঘনাকাশে।
জ্বলিতেছ তুমি ভুজগরাজের দশশত বিষফণার শ্বাসে।

স্থণ্ডিল ভূমে বেদিকা-কুণ্ডে রসনা মেলিয়া আহুতি মাগো,
জীবজগতের জঠরে-জঠরে শমীর কোটরে-কোটরে জাগো।
ঔর্বে জ্বলিছ সিন্ধুগর্ভে, দাবানলে বনে বেড়াও ছুটি,
গলায়ে গিরির ধাতু-শিলাস্থি জ্বলিছ বক্ষ-কটাহ টুটি।

মরুতে জ্বলিছ মৃগতৃষিকায় মেরুতে জ্বলিছ অরোরারূপে।
জ্বলিছ ধরার জরায়ুজঠরে জ্বলিতেছ জ্বালামুখীর কূপে।
মর্মকোষের নিভৃত নিবাসে কতদিন রবে হে তমোপহ?
ফুটাও চিত্ত শিখা-শতদলে, অধ্রুব মোর সকলি দহ।

জ্বলিতেছ তুমি আহবস্তোমে রুধির-মজ্জাসর্পি লভি,
জ্বলিতেছ তুমি সান্ধ্য চিতায় শয়িত যেথায় দিনের রবি।
হিংসায়-প্রতিহিংসায় তব লকলক শিখা নিয়ত যুঝে,
রুদ্রের রোষ কষায়লোচনে ধ্বকধ্বক জ্বলি আহুতি খুঁজে।

পাপীর হৃদয়ে অনুশোচনায় তুষানলে জ্বলি দগ্ধ কর,
বিরহ-কুণ্ডে তুষানলে জ্বলি প্রেম-কনকের শ্যামিকা হর।
জ্বলিতেছ তুমি তরুর শাখায় অশোক-শিমুল-জবার বুকে,
জ্বলিতেছ তুমি আলেয়া-মালায় উল্কামুখিনী শিবার মুখে।

জ্বলিছ বিশ্ব-কর্মশালায়, জ্বলিছ অন্নদেবের যাগে,
জ্বলিছ ওষধি-খদ্যোতে, দীপে, জ্বলিছ কুসুম-শরের আগে।
শোচনায় কর নবজীবনের সূচনার অধিবাসন শুভ,
ঋষির শাসনে কবির ভাষণে উজ্জ্বল তব আসন ধ্রুব।

আমার দেহের স্নায়ুতে-স্নায়ুতে হে বায়ুসুহৃদ্ ছুটিয়া চল,
এ পাপ-মনের কৃষ্ণবর্ত্মে কৃষ্ণবর্ত্মা জ্বল হে জ্বল।
জ্বালাও-তাতাও-মাতাও আমায়, কর মোরে জ্বলদর্চিময়,
মম অবসাদ জড়তা, দৈন্য, কুণ্ঠা, লজ্জা করিয়া ক্ষয়।

মম লালসার খাণ্ডববনে তাণ্ডবে কর মহোৎসব,
ধূমকেতুসম দাও মোরে গতি, অশ্রু-সাগরে হও বাড়ব।
নির্মল কর, নির্মম কর, হে পাবক, মোরে শুদ্ধ করি,
চিতারে চরম মিতা জানি যেন সত্যের তরে যুদ্ধ করি।

দগ্ধ করিয়া জীর্ণ এ দেহ দিবে মোরে ইহমুক্তি যবে,
স্বদেহভস্ম মাখিয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর বিবাগী হবে।
তাও হয় যেন আহুতি তোমার, জন্মবন্ধ দহন লাগি
নির্বাণতরে হে মার-বৈরী বিশ্বপাবক শরণ মাগি॥

দুর্দিনের বন্ধু

বাল্যে উল্লাসেরই মাঝে করিয়াছি তোমা অনুভব,
হেরিয়াছি দোল-মঞ্চে দুলিতেছ, হে নীলমাধব।
হেরিয়াছি হাস্যমুখ পুষ্পে গড়া ঝুলন-দোলায়,
হেরিয়াছি রথ 'পরে আষাঢ়ের সায়াহ্ন-বেলায়,

কত বার কত রূপে। তার পর আসিল যৌবন,
তুমি চলে গেলে কোথা, ভোগ-সুখে হইয়া মগন
ভাবিনি তোমার কথা কোন দিন লইনি সন্ধান।
তুমি-হারা যৌবনের হইয়াছে এবে অবসান,
পুরাতন বন্ধু বলি তোমা আজ খুঁজি চারিধারে,
জীবনে আনন্দ নাই, আশা ডুবে আশঙ্কার ভারে
দুঃখজ্বালা, আধিব্যাধি, ভ্রান্তিভরা দুঃস্বপ্নের জাল
তার মাঝে খুঁজি আজ কোথা গেলে হে নন্দদুলাল।
আমি তোমা ভুলে ছিনু, ভোলনিতো তুমি ব্রজরাজ।
দুর্দিনের বন্ধু হয়ে ফিরে তুমি আসিয়াছ আজ।
দোল ঝুলনের দিন ফুরায়েছে—নাই সে উৎসব,
অভিনব রূপে তাই ফিরিয়াছ, হে ব্রজমাধব।
হেরি তুমি কালীয়ের ফণা 'পরে করিছ নর্তন,
দাবাগ্নির শিখা-শিরে বৃষ্টিধারা করিছ বর্ষণ,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উদ্বেলিত দুরুত্তর যমুনার বারি,
তার 'পরে তরী বেয়ে ধীরে-ধীরে আসিছ কাণ্ডারী।

বৈশাখী সন্ধ্যায়

তখন হয়েছে সন্ধ্যা, নামিলাম দোঁহে ইস্টেশনে
মালপত্র সাথে নাই। সহসা খেয়াল হল মনে
জনশূন্য বনপথে দুইজনে যাইব হাঁটিয়া।
তোমাকে নূতন করে সেইদিন পাইলাম প্রিয়া।
এই সেই বনপথ ছিল যাতে নিত্য যাতায়াত
বিদ্যালয়ে। কল্পলক্ষ্মী-সনে যেথা প্রথম সাক্ষাৎ,
পিককণ্ঠে শুনিতাম যেই পথে তব আগমনী,
মর্মরিত শুষ্কপত্রে যেন তব দূর পদধ্বনি॥

প্রথম বৈশাখ মাস. ঝিরিঝিরি বহিছে পবন
অলক দুলায়ে তব, লাক্ষারক্ত নগ্ন সে চরণ
চুম্বি ধন্য হল পথ। তব পাশে ঘেঁসে-ঘেঁসে চলি
মনে পড়ে প্রেমোল্লাসে মুক্তপথে কত কথা বলি
ভুঞ্জিনু চলন-সুখ। মনে নেই ছিল কোন তিথি
নবোদিত হিমাংশুর করজাল সারা বনবীথি

করিল ধবলায়িত, ঝিকিমিকি রচিয়া কঙ্কণে
পিছলি পড়িতেছিল মুক্ত তব ললাটে আনন্দে।
সঘনে বাজিতেছিল হাতে তব দশগাছি চুড়ি
ক্বণিত মঞ্জীর-সম, দূর হতে সুরভি মাধুরী
বহিয়া আনিতেছিল সমীরণ বনকুঞ্জ হতে
অজানা ফুলের, আর ঝিল্লিরব একটানা স্রোতে
দুধারে ধ্বনিতেছিল। শুষ্কপত্র চরণ-পরশে
মর্মরি জানাল হর্ষ। মনে পড়ে অহেতু হরষে
পুষ্পিত সোঁদাল-শাখা ভেঙে তুমি নিলে ডান হাতে,
সেই ফুল নিয়ে আমি অগুণ্ঠিত তোমার খোঁপাতে
দিলাম গুঁজিয়া প্রিয়ে সন্তর্পণে। মন্থর চরণে
পরিচিত বকুলের তলে যবে এলাম দুজনে,
পাখা ঝট্‌পট করি কোন পাখি হয়ে কৃতূহলী
তব শিরে দিল ঢালি একরাশ ফুলের অঞ্জলি॥

কৈশোর-বান্ধব পথ লাজবর্ষে বরিল তোমায়।
পথ তো ফুরায়ে এল সম্মুখে নগর ডাকে, হায়
খুঁটির লণ্ঠনে ম্লান আলোকের হাতসানি দিয়ে।
মনে হল পথ কেন অফুরন্ত হলনাকো প্রিয়ে,
মনে হল ফিরে যাই এইরূপে সারা রাত ধরি
এই বন-পথ দিয়া দুইজনে আসা-যাওয়া করি।
একটি সন্ধ্যার স্মৃতি মনে আজ জাগে বার-বার
যৌবনের শেষ পর্বে। তেমনটি জীবনে আমার
কখনো পাইনি গৃহে মধুমাসে-শীতে-বরষায়,
সেদিন যেমন করি পেয়েছিনু বৈশাখী সন্ধ্যায়॥

সে যুগ গিয়াছে চলি, স্বচ্ছন্দ বিহারে নেই বাধা।
ঘোমটা-পর্দায় আর ক্ষুণ্ণ নয় নারীর মর্যাদা॥
জিজ্ঞাসিছ ছন্দ রচি, কেন আজ তুচ্ছ কথা নিয়ে?
মুক্ত প্রকৃতির মাঝে তুমি যে দুর্লভ ছিলে প্রিয়ে,
সমাজের কুশাসনে। প্রেম, মুক্তি, প্রকৃতি, যৌবন
এ চারের সম্মিলন সেকালে যে সু-দুর্লভ ধন।
প্রকৃতির পরিবেশে দুটি দণ্ড একদা জীবনে,
হয়েছিল মঞ্জরিত পুষ্পগুলি, ঝরে গেছে মনে।
সেই ঝরা ফুল দিয়ে বসে-বসে গাঁথি আজ হার,
যত তুচ্ছ হোক, এরে সঁপিলাম শ্রীকণ্ঠে তোমার॥

গাগরিভরণ

গাগরিভরণে এসেছিলে তুমি আমার জীবন-দিঘিতে,
গা ডুবায়ে জলে উদাসিনী হলে কী গীতে?
শুনিতে-শুনিতে তন্ময় হয়ে
ডুবি আকণ্ঠ গেলে তুমি রয়ে,
হলনাকো ফেরা, সাঁজের তপন ডুবিল দেখিতে-দেখিতে।

তব মুখখানি কমল হইয়া ফুটে আছে দেখি প্রভাতে,
আলো করি দিঘি অপরূপ নব-শোভাতে।
তব কেশপাশ হল শৈবাল
গাগরি তোমার হয়েছে মরাল,
দিঘির সলিল করে উত্তাল পাখার ঝাপট-আগাতে।

একটি কমল সহস্রদল, পরিমল অফুরন্ত,
মধু গলে তায়, সে ধারায় নেই অন্ত।
মধু হয়ে গেল এ দিঘির জল,
বাসিত করিল তারে পরিমল,
বাণীর বাহন হইয়া মরাল করে তারে প্রাণবন্ত।

কবিতার দিন

মানব যখন হয়নি দানব এমন হিংস্র ক্রূর,
মানুষে-মানুষে ছিল না যখন ব্যবধান এতদূর।
প্রাণ-হরণের চেয়ে বেশি ছিল মন-হরণের ঘটা,
যুগজননীর চিকন চিকরে বাঁধেনি এমন জটা।
উষা যবে ছিল আশায় রঙিন, নিশা ছিল গ্লানিহীন,
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

দৈন্যেরও মাঝে প্রসন্নমুখে লাগিয়া থাকিত হাসি,
গেয়ে যেত নেয়ে ; কারখানা নয়, রাখাল বাজাত বাঁশি।
হকের প্রাপ্য পাইতে হত না ঠকের চরণ ধরে,
পদে-পদে কেহ বাঁধিত না দেহ বিধিনিষেধের ডোরে,
স্বাধীন ছিলাম হইনি গোলাম, নামে শুধু পরাধীন,
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

আকাশ ছিল না আজিকার মতো ধূলিমল-ধূমময়
বাতাসে পেতাম পারুলগন্ধ, বারুদগন্ধ নয়।
নিশ্বাসবায়ু দুর্লভ হেন হত না ভিড়েব মাঝে
ছিলনাকো বাধা-বাধ্যতা এত দিবসের নানা কাজে।
প্রাতে-সন্ধ্যায় মনোনীলিমায় বাজিত রবির বীণ,
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

গেহে ছিল যবে স্বস্তি-শান্তি, দেহে ছিল যৌবন,
বুকে ছিল আশা, মুখে ছিল ভাষা, সুখে ছিল এ জীবন।
ছিল সঙ্গিনী-রসরঙ্গিণী, হাসিমাখা তার মুখ,
নয়নে দীপ্তি, শয়নে তৃপ্তি, আলাপনে কৌতুক।
কমলসুরভি প্রেমহ্রদে ডুবি খেলিত এ মনোমীন।
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

বন্দী করেনি নাগপাশে হেন নিষ্ঠুর সংসার,
করেনি ঝঞ্ঝা-ঝঞ্ঝাট হেন পঞ্জরে চুরমার।
ছিল বটে শ্রম হাড়ভাঙা নয়, ছিল সাথে বিশ্রাম
ছিল না তুচ্ছ উদরান্নের এত কড়া-চড়া দাম।
প্রকৃতির হাতছানিতে চমকি হইতাম উদাসীন,
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

সেই দেহ নাই, সেই গেহ নাই, সেই প্রিয়া নাই আর,
সেই হিয়া নাই—থেমে গেছে গান, শুনি শুধু হাহাকার।
প্রকৃতির ধন সবি পুরাতন আর নাহি মন হরে,
অন্নদা ধরা জরতীর বেশে শুধুই ছলনা করে।
সেই আঁখি নাই, সৃষ্টি মলিন, দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ,
ফুরায়ে গিয়েছে মোর কবিতার দিন।।

বাংলার দিঘি

বাংলার দিঘি গভীর শীতল কবির স্বপ্নে গড়া
ছলছল কল-জলচঞ্চল মাতৃমমতা ভরা।
তব মাধুরীর নাহি পাই সীমা,
কভু বা বারুণী কভু তুমি ভীমা.
তুমি গ্রামান্তে স্বাগত-ভাষিকা দিনান্তদাহ-হরা,
গভীর স্বচ্ছ রবির মুকুর কবির স্বপ্নে গড়া।

ডুবিয়া বিদায় লয় তব বুকে পল্লীর দিনগুলি,
তোমা সম্ভাষে হাসি উষা আসে পূর্ব দুয়ার খুলি।
আধঘুমঘোরে প্রভাত-তপন
তোমারি নয়নে নেহারে স্বপন।
বিদায়বেলায় ছলছল চায়, কাঁপে তায় ঢেউগুলি,
কুমুদীর সাথে নাচে চাঁদ তব তরঙ্গে দুলি-দুলি।

প্রতিদিন বধূ প্রাণের বার্তা কয়ে যায় তব কানে,
গাগরি ভরণে তব বাণী তারা শুনে যায় কলতানে।
জুড়ায় অঙ্গ সোহাগিনী বধূ
ঢালি তরঙ্গে হৃদয়ের মধু,
কমলে তাহাই সঞ্চিত কিনা অলি ছাড়া কেবা জানে?
পায়ের আলতা কোকনদে তারা রেখে যায় প্রতিদানে।

সুন্দর তুমি, হরি তরুণীর লাবণ্য শতদলে,
অথবা তোমারি লাবণ্য তার তনুতটে উচ্ছলে।
দেহে মনে দিয়া মুক্তির স্বাদ,
হৃদয়ে তাহার করেছ অবাধ,
ভরা ঘট তাই শূন্য করিয়া তারা আসে তব জলে,
হৃদয়ের ভার লঘু করে তার তব তরঙ্গতলে।

তব তরঙ্গ মুরছিয়া পড়ে যুগল হৈম ঘটে,
পিতলের ঘট ভেসে গিয়ে ক্ষোভে লাগে ওপারের তটে।
হেরি, গগনের কালো পয়োধর
লোভে বিগলিয়া ঝরে ঝরঝর,
সারা দেহ তব ভরি রোমাঞ্চে যৌবনজয় রটে।
লালপেড়ে শাড়ি লাল ডোরা টানে তোমার হৃদয়পটে।

সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসে দীপ জ্বলে ঘরে-ঘরে,
মাঠের পথিক তব নীরে হেরে আলো ঝলমল করে।
শঙ্খের ধ্বনি বলাকার রূপে
তোমার উপরে উড়ে চুপে-চুপে,
তরুছায়া আঁখিপল্লবসম তোমা নিমীলিত করে,
শতদল-বিভা মরালের গ্রীবা একসাথে ঢলি পড়ে।

বাংলার দিঘি শ্যামল শীতল, কবির স্বপ্নে গড়া,
চাঁদে, চাঁদমুখে—অমল কমলে, কমল নয়নে ভরা।
ঘটে ঘটে ভরি সুশীতল প্রীতি
ঘরে-ঘরে তুমি পাঠাইছ নিতি,
তোমার সলিল পরম শরণ, বিরহবেদনা-হরা,
মরণে বরিতে অভাগী যেথায় চরমে স্বয়ংবরা॥

বিশ্বের প্রতি

কে বলে জড় বিশ্ব তুমি? তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা, একি-এ লীলা-দৃশ্য হেরি দিবসরাত!
জোছ্নাভাতি, তারকাপাঁতি—বিভূতিভূষা অঙ্গময়।
কখনও তব কক্ষ'পরে নৃত্যে তাল-ভঙ্গ নয়।
বারিধি-হ্রদে শারদ নদে ডমরু তলে ডামর-তান,
দোদুল-জটা জলদ-ঘটা দামিনী-ছটা-দীপ্যমান।
ইন্দ্রচাপে সন্ধ্যারাগে কটিতে আঁটা কৃত্তিপট,
ধরেছ পাপ-তামস-তাপ-গরল গলে, রুদ্র নট।
তোমার পাশে গৌরী হাসে বিতরি জীবে অন্নজল,
শস্যশিরে আঁচল উড়ে চরণে ফুরে কমলদল।
তুমি তো জড় সৃষ্টি নহ—তুমি যে নিজে স্রষ্টা, নাথ,
পাগল ভোলা, একি-এ লীলা-বিলাস হেরি দিবসরাত!
শিশিরকণ-মণিভূষণ বনবিতান-বল্লীচয়
আনতফণ ফণীর মতো জড়ায়ে তনু প্রণত রয়।
নর-করোটি তোমার করে, কণ্ঠে মহাশঙ্খ-হার,
ধবলগিরি-বৃষভ বহে শৃঙ্গে মেঘপঙ্ক-ভার;
ঈশান, তব পিনাকে ছোটে অশনি-শর কৃশানুময়,
বিষাণ-রবে ঝঞ্ঝা জাগে ঘোষণা করে ভীষণভয়।
ত্রিশূল তব ত্রিতাপদর্পে ত্রিকাল ব্যেপে ঘূর্ণমান,
অট্টহাসি,—তুহিনরাশি তটিনী কোটি করিছে পান।
রোষ-ভীষণ ভাল-নয়ন—নিদাঘ ভানু নির্নিমেষ ;
রতিপতিরে ঋতুপতিরে দহিয়া করে ভস্মশেষ।
তুমি-তো জড় বিশ্ব নহ—তুমি যে নিজে বিশ্বনাথ,
পাগল ভোলা! একি-এ লীলা, একি-এ খেলা দিবসরাত!

প্রেম ও পূজা

পুবের আকাশ লাল হয়ে ঐ এল
উঠেছে ঐ শুকতারাটি জ্বলি,
ওগো বঁধু নয়ন মেলো
জাগো আমার হৃদয়-কোষের অলি।

পুষ্প-জীবন ফুরিয়া এল মোর
পূজারি ঐ আস্‌ছে হাতে সাজি,
জাগো বঁধু হৃদয়-মধু-চোর,
ভোর আরতির কাঁসর উঠে বাজি।

হাজার চোখে পুব আকাশে চাই
হাজার কানে শুনছি প্রতিধ্বনি,
ফুরাল সব আর যে দেরি নাই
জাগো আমার হাজার চোখের মণি।

বারেক জেগে আমায় বিদায় দাও
হের এ চোখ শিশির যায় ভাসি,
শেষ কথাটি গুঞ্জরিয়া গাও
কর্ণে বহি বিদায় নিক এ দাসী।

দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবার লব
"জন্ম দিও, এবার নিয়ে প্রাণ
এমন দেশে, হয় না যেথায় তব
পূজার লাগি প্রেমের বলিদান।"

বাল্যস্মৃতি

অবাক করিত মোরে
কেমনে শীর্ণ ঝিঙের লতাটি ফুলে-ফুলে যেত ভরে।
ভাবিতাম লতা কোথা হতে এত হলুদিয়া রঙ পায়,
সবুজ কেমনে সোনালি হইয়া খড়ের চালাটি ছায়।
ভাবিতাম তাই, বৈকালী রোদ পান করি তার হাসি
ফুটে কি উঠিল দোচালা ভরিয়া ফুল হয়ে রাশি-রাশি?

অবাক করিত মোরে
শূন্য সে মাঠ সবুজ ফসলে ভরিত কেমন করে।
বৈশাখে শুধু করিত যা ধু-ধু, বহিত তপ্ত হাওয়া
এমন শ্যামল সুষমা সেখানে কেমনে যাইত পাওয়া।
আকাশের মেঘগুলোরে মাটিতে বেঁধে কি রাখিত কেউ?
উড়িতে না পারি চঞ্চল হয়ে তুলিত কেবল ঢেউ?

অবাক করিত মোরে
কেমন করিয়া আষাঢ়ে আকাশ ঢেকে যেত ঘন ঘোরে।
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে খাঁ-খাঁ চারিদিক ঝলসিয়ে যেত আঁখি
চাতক শিশুর তৃষিত কণ্ঠ ফেটে যেত ডাকি ডাকি,
ছুটিয়া আসিত হয়ে কি ব্যথিত শুনিয়া 'ফটিক জল'
ঝরাইত জল তৃষ্ণা হরিতে তাই কি মেঘের দল?

অবাক করিত মোরে
মৌমাছিগুলি কেমনে অমন মৌচাক তোলে গড়ে।
বনের ভিতরে গাছে ফুল ফোটে কেমনে তা পায় খোঁজ!
কতটুকু মধু ছোট মুখটিতে বয়ে আনে তারা রোজ!
সুমধুর সুরে গুঞ্জন করি ঘুরে তারা দলে দলে
তাই কি জমিয়া মোম হয় আর তাই মধু হয়ে গলে?

অবাক করিত মোরে
বাবুই বাসাটি গড়ে তালগাছে কত দিনরাত ধরে।
শাবকেরই তরে দোলা, বাসা নয়, ভিজে মরে তাই নিজে।
ভাবিতাম দেখি, সে তো ছোট পাখি, তারও ভালোবাসা কি যে।
আহার আনিতে যায় দূর পথে বাসা চিনে ঠিক ঢোকে,
মিহিন সুতায় বাঁধা থাকে সে কি দেখিতে পাইনা চোখে?

কেরানির রানী*

যখন সঘন গৃহিণী গরজে বরিষে বকুনি-ধারা,
সভয়ে অমনি আবরি নয়ন, লুপ্ত সংজ্ঞা-সাড়া।
রক্তিমাধরে অধীর রাগে তাহার আননখানি
সতত কুঠার-পাণি সে-যে গো আমার নিঠুরা রানী॥

জ্যোৎস্না-নিশীথে তাহার সকাশে পরান বেহাগ গাহে,
ত্রস্তে স্মরি যে শ্রীহরি, ঘরনী যেম্‌নি গহনা চাহে।
তখন তাহার চরণে বিরাজে আমার চতুর পাণি,
আমার কুটির-রানী সে-যে-গো আমার হৃদয়-রানী॥

আপিসে-হোটেলে-বাজারে-গঞ্জে সকালে-বিকালে-সাঁঝে,
তাহার ভ্রূকুটি কাঁপায় হৃদয়ে, আর তো সকলি বাজে।
সাহেবেরো তাড়া চেয়ে হায় তারে বড়ই কঠোর জানি
আমার কাঠের ঘানি সে-যে-গো আমি তা একাই টানি।

বহুদিন পরে করেছি আবার এবার ছুটির দাবি,
দেখিব হরষে বধূরে সাদরে হইয়া অধীর ভাবি।
শুনিব কলহ রাসভ-কণ্ঠে শাসনপ্রখর বাণী!
আমার ছুটির রানী সে-যে-গো মূর্তা বিদায়-বাণী॥

গাধা

উষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভাই ছাগলের দাদা তুমি গাধা,
অশ্বের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি কে তোমার বুঝিবে মর্যাদা?
শীতলা-বাহন ছিলে, ছিল তব মান,
সে মান হরিয়া নিল ভ্যাকসিনেশান।

---

* দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি গানের প্যারডি।

বিবিরা-বাবুরা শেষে তব মান-ইজ্জত বাঁচায়।
রাশি-রাশি ধুতি-শাড়ি ঘন-ঘন তাহারা কাচায়।
ধোবার বাবার সাধ্য নয়—
সে গন্ধমাদন ঘাড়ে বয়।
সর্বংসহ ধুরন্ধর তোমার শরণ—
নিল শেষে রজকনন্দন।
হলে তুমি 'রাজকীয়' জীব—
অনেক টাকার বেশ তব অঙ্গে। কে বলে গরিব?
বিলাসিনী-বিলাসীর পরম বান্ধব হল ধোবা,
তাহার বান্ধব তুমি, হে নিরীহ বোবা।
নিঃশব্দে বহিছ ভার তাই তোমা বোবা বলিলাম,
তোবা, তোবা! কে না জানে তব কণ্ঠস্বরের সুনাম?
রেডিওর যোগ্য তব উচ্চ-কণ্ঠরব
তোমার সংগীত যেবা বুঝেনাকো সেই তো গর্দভ।
বক্তৃতা করিলে তুমি, মায়িকের নেই প্রয়োজন,
অমায়িক জীব তুমি, দীর্ঘপুচ্ছ সুদীর্ঘশ্রবণ।
কোটপ্যান্ট পরি যবে বসো গিয়ে আফিসে চেয়ারে,
তখন গর্দভ ছাড়া কে চিনিতে পারে?

চৌপদি*

(২)

একটি কণাও শিশিরের বারি ব্যর্থ নয়,
তারা—কিছু না পারুক ফুটায় কুন্দ-কলি।
তুচ্ছ হউক তৃণপুষ্পও ব্যর্থ নয়,
ভরে যথাশক্তি সৃষ্টির অঞ্জলি॥

(৩)

ধার্মিক নয় সেই সকলের চেয়ে
ধর্ম-ধর্ম চিৎকার করে যেবা,
মন্দিরচূড়ে বসি ডাকে সারাদিন
পুণ্য পক্ষী কাকেরে বলেছে কেবা?

---

* নির্বাচিত অংশ

(১২)

যতটা গর্জন তব ততটা বর্ষণ তব নয়
এ-দেবমাতৃক দেশে তবু করি তোমারে বরণ।
অনাবৃষ্টি লেগে আছে এই দেশে সকল সময়
কি উপায় আছে বলো না লইয়া তোমার শরণ॥

(২৬)

বসুধা-কুক্ষিতে যত শস্য-ধাতু-ধন
উদ্ধার করিতে হবে করি প্রাণপণ।
বেচারাম বিশ্বাসের ধন যদি পায় কেনারাম,
ধনবৃদ্ধি নয় তার নাম!

(৪২)

মম পল্লীর বধূদের চোখে কাজলধোয়া যে জল
কাজলা দিঘিতে করে তাই ছলছল,
আমার কবিতা সেই দিঘি-নীরে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে চঞ্চল,
বিকশিত হল শরৎপ্রভাতে হয়ে নীল উৎপল॥

(৪৪)

রামায়ণে কয়জন বানরের খাতিরে
আজো মোরা পূজি গোটা বানরের জাতিরে।
শিবের বাহন ষাঁড় কৈলাসশিখরে,
বেপরোয়া সব ষাঁড় হাটে তাই বিহরে॥

(৪৭)

বিদ্যাবুদ্ধি সব ভুলে হও শিশুর মতো বিশ্বাসী,
হও বিভূতির অপ্রাকৃতের অলৌকিকের তল্লাশি।
লজিক-ফিজিক্‌স ভুলে শরণ লও ম্যাজিকের ভাণ্ডারীর,
মুক্তি তো চাও, যুক্তি তোলো, উক্তি শোনো কাণ্ডারীর॥

তোমরা ও আমরা

(১)

হোমড়া চোমড়া তোমরা মোটরে ধাও,
আমরা হোঁচট খাই।
চাকার কাদার ছিটেয় সাজিয়া ভূত
আফিসের পানে ধাই।

চলি হাঁটুজলে রাস্তা খুঁজিয়া-খুঁজিয়া,
হেঁটোর কাপড় কোমরে তুলিয়া গুঁজিয়া,
দেরি হলে পাছে রুজি মারা যায় বুঝি বা
চলি তাই ছুটিয়াই॥
গরমের দিনে তোমাদের ঘরে-ঘরে
ফ্যান ঘুরে ফন-ফন।
আমরা দুপুর রৌদ্রে পেটের দায়ে
ঘুরে মরি বন-বন॥
শাল-দোশালায় তোমরা বেড়াও সাজিয়া,
পরি ছেঁড়া জামা গা'র তেলে মোরা ভাজিয়া,
করিয়াছি ধোপা নাপিতের সাথে কাজিয়া,
মিটাতে ইচ্ছা নাই॥
তোমরা পোলাও দেখায়ে দেখায়ে খাও
মোরা খাই নিমসীম,
তোমরা মোরগ-হংস-ডিম্ব খাও,
আমবা ঘোড়ার ডিম।
চপ্‌কাট্‌লেট হোটেলে গিলিয়া ঠাসিয়া,
সিনেমায় যাও পেটের গেঞ্জি ফাঁসিয়া,
আমরা যেন গো বানে আসিয়াছি ভাসিয়া,
খালি পেটে তুলি হাই॥
দু-পুরু গদিতে তোমরা ডাকাও নাক,
সিংহনিনাদ ছাড়ি
আমরা কুঁড়েয় আঁস্তাকুড়ের ধারে
সারারাত মশা মারি।
তোমরা বিশাল তোমরা সবাই হস্তি,
আমরা ফড়িং দেহে প্রাণটুকু অস্তি,
তোমাদের সাথে কেমনে হইবে দোস্তি?
আচ্ছা বলত ভাই॥

(২)

জেলে যেতে যেতে বেঁচে যে করেছি টাকা
তার ভাগ বুঝি চাও?
দুপুর-বেলায় একটু ঘুমুই তাই
হিংসেয় মরে যাও॥
চপ কাটলেট কোপ্তা কাবাব খাই,
হজমের ঠেলা আমরাই সামলাই,

বুক জ্বলে পুড়ে করিবে যে আইঢাই,
এক দিন যদি খাও ॥

জাননা তো চাঁদ গালে ক্ষুর ঘসে নিতি
কামানোর কত ঠেলা,
সাবান ঘষিতে জান না তো গায়ে জোর
লাগে কত দুই বেলা।
হিংসেয় মরো, আমরা বোতল টানি,
খাও দেখি চাঁদ আমাদের লালপানি ?
ভারি তো মুরদ থাক, থাক, জানি-জানি,
হও কেন পিছু-পাও ॥
'ফ্যাসন্'-মাফিক পোশাক করিতে হয়
খেটে-খুটে সাবধানে,
গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় কত বয়ে
ধোপার গাধাই জানে।
সাহেব-সুবোর সাথে খেলা, বসা, চলা,
বাংলা নয় গো ইংরাজি কথা বলা,
কত ঠেলা জানো, মাঝে-মাঝে কানমলা
চুপ করে সই তাও ॥

সোজা নয় চাঁদ ভালো খাওয়া ভালো পরা,
মোটর ল্যাণ্ডো চড়া,
দেনার খবর যদি শোনো তবে হবে
চোখ দুটা ছানাবড়া।
ঘুঘু দেখিয়াছ, ফাঁদ তো দেখনি তার,
দোকানের বিল দেখ যদি একবার,
হয়ে যাবে তবে আধ-হাত জিভ বার।
বকায়ো না। নাও! নাও !!

নেশাখোরের অভিধান

গাঁজা খেলে 'গেঁজেল' যদি, মদ খেলে হয় 'মাতাল',
নস্যি নিলে 'নেসেল' তবে,—চা-খোরেরা 'চাতাল'।
ফুরুক্-ফুরুক্ গুড়ুক তবে টান্‌লে পরে 'গুর্‌খা' হবে,
চুরুট খেলে 'চোর্‌ঠা' বুঝি গুলি খেলে 'গুলাল'॥

সুরতি খেলে "সূর্তিবাজ-তো" স্ফূর্তিবাজের মতোই,
চরস রসের হরষ পেলে 'চৌরস' হয় স্বতই।
রাখলে দাড়ি যদি 'দেড়েল' তাড়ি খেলে তবে 'তেড়েল'
চণ্ডু খেলে 'চণ্ডাল' হবে, অর্থাৎ হবে চাঁড়াল॥
সিদ্ধি খেলে সিদ্ধপুরুষ 'সিঁধেল' বলে কেউ-কেউ।
বিড়িখোররা 'বিড়েল' হয়ে করবে তবে মেউ-মেউ।
কোকেনখোরে কি বলে ভাই চলন্তিকায় খুঁজেই না পাই,
আফিমখোরের পাইনাকো নাম ভেবে আকাশ-পাতাল॥

অপূর্ব প্রতিহিংসা

"পুত্র তোমার হত্যাকারীরে পাইনিকো আজো ঢুঁড়ে,
আফশোস তাই জ্বলিছে সদাই তামাম কলিজা জুড়ে।
তার তাজা খুনে ওজু করে আজো নামাজ করিনি তাই,
আত্মা তোমার ঘুরিছে ধরায়, স্বর্গে পায়নি ঠাঁই।
বাঁচিয়া থাকার কথা নয় আর তোমারে হারায়ে, বাপ,
কেবল তোমার মুক্তির লাগি সই দুনিয়ার তাপ।"
বলিতে বলিতে রুমালে অশ্রু মুছিলেন ইউসুফ,
হেন কালে এক ঘটনা ঘটিল অদ্ভুত, অপরূপ!

শশকের মতো ত্রস্ত-ব্যস্ত যুবক একটি ছুটে
ভয়ে থর-থর কাঁপিতে-কাঁপিতে চরণে পড়িল লুটে
কহিল,—"জনাব, রক্ষা করুন, দুশ্‌মন পিছে ধায়।
দিন্ দয়া করে আপনার ঘরে আশ্রয় অভাগায়।"
ইউসুফ কন,—"আল্লার ঘর, মোর ঘর কেন কহ?
অজানা অতিথি, নির্ভয়ে তুমি তাঁর ইদ্‌গাতে রহ!"

বহুদিন পর ঘুমাল অতিথি মক্‌মলি বিছানায়,
হেন দামী খানা বহুকাল তার জুটেনিকো রসনায়।
"সুখসুপ্তেরে জাগাইয়া কন শেষ রাতে ইউসুফ,
অজানা অতিথি পালাও এবার দুনিয়া এখনো চুপ।
লও টাকাকড়ি দুদিনের খানা আর লও তরবারি,
আশখানা হতে ঘোড়া বেছে নিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি।"
নড়িতে চাহে না মুসাফির, বলে,—"বাঁচিতে চাহিনা আর
জীবন আমার সঁপিয়া দিলাম শ্রীচরণে আপনার।
ইব্রাহিমের গুপ্তঘাতক আমি ছাড়া কেউ নয়।
ঐ অসিখানা এ বুকে হানুন,—ইমানের হোক জয়॥"

সত্যদেবতা জাগিলেন ক্ষমাসুন্দর আঁখিতলে,
মরণের ভয় করি পরাজয় হৃদয়-পদ্ম-দলে।

বৃদ্ধের আঁখি বজ্রের মতো সহসা উঠিল জ্বলি
বজ্রদীর্ণ মেঘের মতনই অশ্রুতে গেল গলি।
বলিল বৃদ্ধ—"এত দিনে এলি, এতকাল খুঁজিলাম,
নিজে এসে হাতে ধরা দিলি আজ। ঘাতক, কি তোর নাম?
থাক,—নামে আর কি কাজ আমার—মাফ করিলাম তোরে,
সব-সেরা ঘোড়া দিলাম, এখনি পালা তার পিঠে চড়ে।
পাঁচগুণ টাকা নিয়ে যা সঙ্গে—চলে যা সুদূর দেশে
মানুষের মন বড় দুর্বল কাজ কি এদিকে এসে?"

তারপর চেয়ে আশ্‌মান্‌ পানে বৃদ্ধ কহিল—"বাপ!
শত্রুরে তোর কৃপাণের তলে পেয়েও করিনু মাফ।
এতদিন পরে তোর হত্যার লইলাম প্রতিশোধ,
খুনের তৃষায় করিব না আর স্বর্গের পথরোধ॥"

রথী ও সারথি

লয়ে রথ, কেতু, বারণ, বাজী
কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব উভয় বাহিনী এসেছে সাজি।
অর্জুনরথে বাসুদেব নিজে সারথি আজি।
স্থাপিত সে রথ দুই বাহিনীর মধ্যভাগে,
চাহি চারিদিকে পার্থের বুকে বিষাদ জাগে॥

কহিল পার্থ, "চারিপাশে হেরি জ্ঞাতিবান্ধব স্বজনগণ,
ইহাদের মোরে বধিতে হইবে করিয়া রণ?
দেহ যে আমার এলাইয়া পড়ে, কাঁপিছে বুক,
সর্ব অঙ্গে শিহরণ জাগে, শুকায় মুখ।
হাত হতে মোর খসিছে ধনু।
যেন বিষজ্বালা দহিছে তনু।
স্থিরতা হারাই, ধীরতা হারাই, টলিছে মন,
চারিদিকে হেরি অলক্ষণ॥

বিজয়ী হইতে চাহি না, কৃষ্ণ, যুদ্ধের সাধ গিয়াছে ঘুচি,
রাজ্য চাহি না, শোণিতসিক্ত সুখভোগে মোর নাইকো রুচি।
কিবা প্রয়োজন রাজ্যে বলো,
যাদের জন্য রাজ্য তাদের যদিই সমরে বধিতে হল।

এই বসুধার রাজ্য তো ছার তুচ্ছ কথা,
ত্রিলোক রাজ্য দিলেও করিতে পারিব না হেন বর্বরতা।
তার চেয়ে ওরা হরণ করুক আমারি প্রাণ,
তাহাতে বরং রুদ্ধ হইবে অকল্যাণ।

এই বলি ত্যজি ধনুর্বাণ
রথের উপরে এলায়ে পড়িল ধনঞ্জয়।
কহিলেন হরি—"ক্লীবভাব করি সমাশ্রয়,
একি দুর্মতি হল সম্প্রতি হে ফাল্গুনি,
একি কথা তব কণ্ঠে শুনি!
ভুলে গেলে তুমি ক্ষত্রিয়বীর, ধর্ম তোমার ন্যায়সমর,
ভুলে গেলে তুমি মানব কখনো নয় অমর॥

তোমার মুখে কি শোভা পায় ভাই এ সব কথা,
উঠ-উঠ বীর, ধর গাণ্ডীব, ত্যজ হৃদয়ের দুর্বলতা।
বিজ্ঞের মতো বলিতেছ কথা, অজ্ঞের মতো তব আচার,
ক্ষত্র হইয়া শূদ্রের মতো ভাব তোমার।
দেহের জন্য শোক করে কভু বিজ্ঞজন?
দেহ আজ আছে, কালই তো তাহার হবে পতন।
তুমি শুধু দেহ? দেহের মরণে মরণ নয়,
তুমি যে আত্মা। আত্মা অমর,—ধনঞ্জয়॥

দেহ জন্মায়, ধবংসও পায়, অমরাত্মার তাতে কি ক্ষতি?
জেনো চিরকাল অনন্ত পথে তাহার গতি।
জীর্ণ বসন ত্যজিয়া যেমন মানুষ নূতন বসন পরে,
জীর্ণ শরীর ত্যজিয়া তেমনি আত্মাও নবশরীর ধরে।
অস্ত্র তাহারে ছেদিতে পারে না, অগ্নি তাহারে দহিতে নারে।
আত্মা কখনো ভিজে না সলিলে, অনিল পারে না শুকাতে তারে।
শরীর মরিলে মরেনাকো কেহ, তবে আর তুমি হন্তা কিসে?
নব দেহ লয়ে ফিরিবে আত্মা, জ্বলিতে হবে না জরার বিষে॥

তুমি ভাবিতেছ এই দেহকেই চরম যেন,
তাই তব শোক। অনিত্য এই দেহবধে দ্বিধা কুণ্ঠা কেন?
যদি বল এই দেহহত্যাও একটা পাপ,
তাহাতেও বীর মিথ্যা তোমার মনস্তাপ।
ক্ষত্রিয় তুমি তোমার ধর্ম,—ধর্মরণ,
তাই তব শ্রেয়, কর স্বধর্ম প্রতিপালন।

এই যে যুদ্ধ এ তব স্বর্গসেতু-সমান।
যে ক্ষত্র যুঝে ধর্মক্ষেত্রে সেই ক্ষত্রই ভাগ্যবান॥

ধর্মযুদ্ধ ত্যাগ কর যদি কীর্তি-ধর্ম হারাবে দুই,
বীরের পক্ষে তাইতো মৃত্যু, লজ্জার কথা নয় শুধুই।
ভয় পেয়ে তুমি যুদ্ধবিমুখ ভাবিবে কর্ণ দুর্যোধন।
তোমা কাপুরুষ প্রাণভয়ে ভীত ভাবিবে স্বজন বন্ধুগণ।
নিহত হইলে পাইবে স্বর্গ, জয়ী হলে পাবে মর্ত্যসুখ,
তাই বলি বীর, উঠ, হয়োনাকো রণবিমুখ॥

তুমি ক্ষত্রিয়, এর চেয়ে নেই ধর্ম বড়,
তুমি পৌরব, এর চেয়ে কিবা আছে গৌরব মহত্তর?
সিংহের মতো গর্জন করি পুন গাণ্ডীব তুলিয়া ধরো,
লাভ-ক্ষতি-ক্ষয়ে জয়-পরাজয়ে সমান গণিয়া যুদ্ধ করো।
উদ্যম তব স্বধর্ম, তুমি অপরাজেয়,
শোক, কারুণ্য, অবসাদ পরধর্ম হেয়,
পরধর্মেরে ভয়াবহ জেনো, স্বধর্মে তব নিধন শ্রেয়।
কর্মে তোমার শুধু অধিকার, ফলে অধিকার তোমার নয়,
ফলাফলে তুমি উদাসীন হয়ে পুন ধনু ধর, ধনঞ্জয়॥

যাহাদের ভ্রাত, ভাবিছ জীবিত এ ধরাতলে,
আগে হতে তারা জেনো প্রাণহারা, আপন আপন কর্মফলে।
এই অনিত্য দেহটারে তুমি ভেবোনা বড়,
বৃথা কার তরে কাঁদিয়া মর,
তুমি নিমিত্ত গাণ্ডীবসম, উঠ, স্বধর্ম পালন কর॥"

নত মস্তকে শুনিল সকলি পার্থবীর।
হেরিলেন হরি মোহ পরিহরি উৎসাহে বীর তুলে না শির!
বলিলেন প্রভু—"গেল না তোমায় তামসিকতা?
শোন তবে বলি পরমতত্ত্ব যোগের কথা॥"

* * *

একে-একে সব যোগ ব্যাখ্যান করিয়া তখন শ্রীভগবান
বলিলেন—"শোন হে মতিমান্,
আমিই সকল প্রাণীর শরীরে আত্মার রূপে বিরাজ করি,
পালন করিয়া সকল জীবেরে আমারি অঙ্কে রেখেছি ধরি।
আমিই আবার সংহার করি, আমাতেই সব বিলয় পায়।
সর্বভূতের বীজ বলি তুমি জেনো আমায়।

এই চরাচরে কিছু নাই যাহা আমার বাহিরে থাকিতে পারে।
মোর বিভূতির অন্ত নাই এ ত্রিসংসারে।
আমি ভগবান আমিই তোমারে বুঝিতে বলি।
আর কেন মোহ? বীরতেজ তব উঠুক জ্বলি॥"

বলিল পার্থ—"মোহ দূরে গেছে বুঝিয়াছি আমি তুমিই সব।
তুমি ভগবান্ কি বলি করিব তোমার স্তব?
তবু প্রভু মোর আকিঞ্চন,
যদি কৃপা হয় বিশ্বেশ্বর-রূপ তব কর প্রদর্শন॥"

কহিলেন প্রভু—"স্থূল চক্ষুতে দেখিতে পাবে না সে রূপ মম,
তোমারে দিলাম দিব্যচক্ষু হে প্রিয়তম।"
এই বলি হাসি ভুবনভূপ
ধরিলেন নিজ অসীম বিরাট বিশ্বরূপ।
সে রূপ হেরিয়া ভয়ে বিস্ময়ে কম্পমান
করিল পার্থ দুই হাত জুড়ি স্তোত্রগান।
কে তুমি উগ্ররূপধারী বলো, হও প্রসন্ন, নমঃ হে নমঃ,
নমি আদিদেব, জানাও আমায় তোমার প্রকৃতি গুহ্যতম।
কাঁপিতে-কাঁপিতে অর্জুনবীর প্রণত হইল ক্ষণেক থামি।
কহিলেন হরি, "উঠ রথ পরি, শোন বলি তবে কে হই আমি।

আমি মহাকাল লোকনাশকারী ত্রিলোকে ভূভারহরণে রত,
বধো বা না বধো কেহ বাঁচিবে না শত্রুদলের যোদ্ধা যত।
অরাতি জিনিয়া রাজ্য লভিতে উঠ জাগো, হও যশের ভাগী।
হও নিমিত্ত, আগেই নিহত অরাতিগণের বধের লাগি।
আগে হতে হত ভীষ্ম দ্রোণেরে সমরে নিহত করিতে হবে,
মাভৈঃ, যুদ্ধে জয়ী হবে বীর বারবার রণে সগৌরবে॥"

কেশবের কথা শুনিয়া কিরীটী কম্পিত দেহে যুক্ত পাণি
বার-বার নমি বলিলেন ধীরে গদ্‌গদ স্বরে ত্রস্ত বাণী।
তব অপূর্ব রূপ হেরি দেহে জাগে রোমাঞ্চ, কাঁপি যে ত্রাসে,
হও প্রসন্ন, তোমার সৌম্য সেরূপ আবার দেখাও দাসে।
দেখা দাও মোরে কিরীট চক্র গদা—চারি হাতে ধরিয়া হরি,
সংবর তব বিরাট স্বরূপ ; সে রূপ হেরিতে বাসনা করি॥

দিনশেষের গান

চিন্তা কি আর দিন তো এল ফুরিয়ে।
ক্ষতি-লাভের খতিয়ানে দিই তুড়িতে উড়িয়ে॥
অস্তরবির বিদায়-কিরণ
ছড়ানো শেষ মুঠাব হিবণ
ছন্দপুটে বন্দী করে যাচ্ছি রেখে কুড়িয়ে॥

বলাকারা ধায় অসীমে পাখছানিতে যায় ডেকে,
মনের ডানার ঝটপটি সার, উড়তে সে চায় তাই দেখে
দিগন্তের ওই সন্ধ্যামণি
পাঠায় রঙিন আমন্ত্রণী
দূর সাগরের উদাস হাওয়া তপ্ত হৃদয় দেয় জুড়িয়ে॥

নেই কোন যান চলার পথে, সবার এ পথ হয় হাঁটিতে।
লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটি খেয়া-নায়ের পারঘাটিতে।
বনের পাখি গায় পূরবী—
কয় তারা, 'ভয় কিসের কবি?'
ছায়ায় ছায়ায় পায়ে পায়ে শুকনো পাতা [illegible] গুঁড়িয়ে॥

জ্ঞানের চেয়ে কাজের চেয়ে ভেবেছিলাম কথায় সার,
ভাপে ভরা কথার ফানুস—তাও যে এখন লাগছে ভার।
চাই যে এখন নীরবতা,
ফুরিয়ে এল আমার কথা,
কালের রাখাল ছাড়ল ধেনু, নটেগাছ সে খায় মুড়িয়ে॥

গোধূলি

পশ্চিম দিগন্তে রবি ডুবি-ডুবি করি
এখনো ডুবেনি, অস্ত-সাগরের তরঙ্গ-উপরি,
উঠে-নামে, যেন নাচে। মেঘের চিকুর
ঢাকে, পুন মুক্ত করে দিগঙ্গনা-সীমন্তে সিঁদুর।

অন্যমনে দেখি তাই, ভুলে যাই দিবা-অবসান।
তুরন্ত ফিরিছে নীড়ে আকাশে উড়ন্ত যত গান।
রাখালের বেণু তোলে গোঠ-পথে পূরবীর সুর,
উদাসী-পিয়াসী কানে লাগে সুমধুর।

ধেনুদল আসে ফিরে যেন দুধগঙ্গার তুফান,
বধূরা ফিরিছে ঘরে তুলি ঘটে কাঁকনিয়া তান।
হাঁসগুলি ফিরে ঘরে শ্রান্তপদে সন্তরণ ছাড়ি,
কৃষকেরা ফিরে ঘরে শুষ্ক ক্ষেতে জলসেচ সারি।

আলোক ফিরিয়া যায় দৃষ্টিপথ হতে ধীরে-ধীরে,
ফেরার সময় এটা আমারেও যেতে হবে ফিরে,
কোথায় কে জানে?
যেথা হতে আসিয়াছি হয়তো সেখানে।
রক্তচন্দনাক্ত ভাল চেলাম্বর পশ্চিম গগন,
এই তো সে গোধূলি লগন।

এ জীবনে সুদীর্ঘ গোধূলি,
আসন্ন যে মহাযাত্রা বারবার যাই তাই ভুলি।
ধরার বন্ধনজাল ছেদিবার কিছু অবসর
দিতে বৃথা এ অধমে ডুবেনি কি দেব দিবাকর?

গির্জার ঘণ্টা

ঘণ্টা বাজে, মনটা কাজে লাগছে না।
ঘুমটা কারো ভাঙছে না, কেউ জাগছে না।
ঘণ্টা বাজে, একাই ক্বণন শুনছি তাই,
একটি দুটি করি রণন গুনছি ভাই।

ঝাঁক বেঁধে সব নিরুদ্দেশে যায় চলে,
ডাক দিয়ে যায় তারা আমায় 'আয়' বলে।
ভাষা তাদের ভাসা-ভাসা বুঝছি আর,
আসল মানে নিজের প্রাণেই খুঁজছি তার॥

ঘণ্টা বলে—হাতের বাকি নে সেরে।
মরীচিকার পিছন ধাওয়া দে ছেড়ে।
ঘণ্টা বলে—সকল বাঁধন কর ঢিলে,
গানের চরণ থাকুক পড়ে গরমিলে।
এখনো যে সরাইখানার টান ভারি,
ডাকছে শোন্ ওই শিঙার ফুঁয়ে কাণ্ডারী।
ঘণ্টা বলে—পাড়ের কড়ির কই পুঁজি,
পাবি না তা আলমারিটার বই খুঁজি॥

রেখে দে তোর যুক্তি-বিচার চুল চিরে।
ভুলাবি কি তাতে ঘাটের শুল্কীরে!
ঘণ্টা বলে—কণ্ঠাগত প্রাণটা যে
লাগবে কি আর খ্যাতি-খাতির-মান-কাজে?
যাবে না বাগ্‌বিলাস-ছটা সঙ্গে তোর।
ছন্দ-অলংকারের ঘটা অঙ্গে তোর।
ক্ষোভ-অভিমান ফেল্ মুছে, রয় যা জমা।
সবার কাছে বিদায় নিয়ে চা ক্ষমা॥

নীড় ও আকাশ

ভালোবাসো যদি এই শ্যামা ধরণীকে,
আলোয়-আলোয় ভালো করে চেয়ে দেখ তার চারিদিকে।
উপভোগ্যের করে কত আয়োজন
তোমা নিতি-নিতি তাহার প্রকৃতি জানায় আমন্ত্রণ।
দুদিনের এই মধুপ-জীবন খধূপ যাতে না হয়
প্রতিখন তার করে তোলো মধুময়।

চেয়ো না-চেয়ো না নিশীথ আকাশপানে
উদাসী করার সে মায়ামন্ত্র জানে।
অসীম গগন লয়ে অগণ্য তারা
সহজ মানুষে ফানুস বানায়ে করে দেয় দিশেহারা।

ইঙ্গিত হানে কী যে কানে-কানে কয়,
এ ভোগভূমির সকলি তুচ্ছ হয়।
তুচ্ছ হয় এ গৃহ-সংসার, করে সে অন্যমনা,
হয়ে যায় এই বিরাট বিশ্ব একটি সরিষাকণা।

চেয়োনাকো নীলাকাশে,
অট্টহাস্য হাসে সে দিবসে, রাতে মৃদু-মৃদু হাসে।
আভাসে জানায় ভবসংসার সুতসুতা-মিতা-জায়া।
সব ঝুটা, সব মায়া।

সহজ হবে না মনের স্বস্তি রাখা,
উড়িবার সাধ জাগাবে শুধুই, দিতে পারিবে না পাখা।
অনেক আয়াসে গড়া কুঞ্জের নীড়
যেথা কচি-কাঁচা শাবকেরা করে ভিড়
পাবেনাকো তা-তো খুঁজি,
মনে হবে তার মমতায় হল জীবন ব্যর্থ বুঝি।

শুনোনা-শুনোনা ওই আকাশের গান
বলে সে,—মিথ্যা, সবই অনিত্য, নেই এ বর্তমান।
আছে শুধু দূর-অসীম ভবিষ্যৎ,
যাইতে সেথায় নেই কোন ছায়াপথ।

অবিরত মনে প্রশ্ন জাগায়ে অধীর করে সে প্রাণ,
দেয় না সে সমাধান।
ব্যোমে ব্যোমকেশ বিষাণে তোলে যে তান,
কানে গেলে তা যে রয় না নীড়ের টান।

সারা অম্বরে নাচে যে দিগম্বর
হেরি তা বিষম হবে দিগ্‌ভ্রম, ভুলাবে আপন-পর।
চেয়ো না চেয়ো না নিশীথ আকাশপানে
আকাশ সবারে কাজ হতে শুধু অকাজেরই পানে টানে।

কবির কামনা

কুসুমের বনে যে জীবন যাপে প্রজাপতি
এ ধরায় আমি সে জীবনখানি চাই।

সে জীবনে নাই কোন ভয়ভীতি-ক্ষয়ক্ষতি,
নাইকো বরষা শীতের পীড়ন নাই।

হিসেবি লোকেরা বলে,—"হয়োনাকো প্রজাপতি,
সঞ্চয়ী নয়, দুর্দিনে তারা মরে।
হও মৌমাছি, দেখ তারা নয় মূঢ়মতি,
শীতের জন্য মৌচাক তারা গড়ে।"

ফুলই যখন ফুটিল না হায় ধরণীতে,
শুষ্ক-নীরব কুঞ্জকানন সবই,
কি লাভ বাঁচিয়া জীবনের সেই হেয় শীতে
মরণই তো শ্রেয়,—চিরদিনই কয় কবি।

ফুল ফুরাইলে জীবনও ফুরায় যার
সেই প্রজাপতি হতে আমি চাই তাই!
পুষ্প-বিহীন হবে যবে সংসার
চক্রকুহরে বাঁচিতে চাহি না ভাই।

সোমপায়ীর গান*

মনে হয় অরিজনে করি আজ ক্ষমা,
ভুলে গিয়ে রাগ-রোষ ক্ষোভ-দ্বেষ জমা।
মনে হয় উঁচু-নিচু সবাই সমান।
আমি কি করেছি সোম পান?
মনে পড়ে যতকিছু করিয়াছি পাপ,
সে সবের তরে মোর হয় অনুতাপ।
করিয়াছি আমি যেন অমৃতে সিনান।
আমি কি করেছি সোম পান?
মনে হয় এ মোর ঠাঁই সকলের নিচে,
আমি কবি এ কথাটা আগাগোড়া মিছে।
বড় ভুল করিয়াছি পুষি অভিমান,
আমি কি করেছি সোম পান?
মনে হয় জগতে সুত-মিত-জায়া
যাহাদের মোহে মজি, সবি তারা মায়া।

---

*ঋগবেদের সোমসূক্তের অনুসরণে

মনে হয় কে আমারে করিছে আহ্বান।
আমি কি করেছি সোম পান?
মনে হয় আমি যেন এ ধরার নই,
কার অভিশাপে যেন হেথা আমি রই।
হল কি আমার আজ শাপ অবসান?
আমি কি করেছি সোম পান?

জুঁই-এর গন্ধে

নগরপথে যেতে-যেতে গন্ধ মধুর পেয়ে
শেঠের কুঠির গেটের পরে চম্‌কে দেখি চেয়ে—
জুঁই ফুটেছে, পেলাম তাদের হাসির নমস্কার
অঙ্গে আমার করল হঠাৎ রোমাঞ্চ -সঞ্চার
ঠাণ্ডা পরশ তার।
আমার কানে মিঠে গলায় জুঁই-এর গন্ধ কয়
"চিনতে পার? জানি কবি তোমার পরিচয়।
কিন্তু একি! তোমারো নেই বিন্দু অবসর,
তুমিও হায় সবার মতো করছ অনাদর!
ভাবছ আমায় পর!
শোনো তবে, তিনশ বছর আগেও ছিলে কবি,
এই জনমে ভুলে গেছ সেই জনমের সবি।
তোমার বেঁশো-খড়ো ঘরের গুঞ্জিত অঙ্গনে
জুঁই-এর মাচা বাঁধা ছিল পুঁই-এর মাচার-সনে
পড়ছে তা কি মনে?
কাজলা ঋতুর বাদলা বাতাস এমনি ছিলাম ভরে
চিনতে পার কিনা দেখ বাতাস টেনে জোরে।
শর-কলমে তুলোট 'পরে লিখতে ব্রজ-গীতি,
যেতাম রয়ে তাতেও হয়ে ঝুলন-দোলার স্মৃতি
লীলার রসে তিতি।
জুঁই-এর মতোই ফুটতো সে গীত, একটু সুবাস দিত,
বিদায় নিলেও জীবন-ধারায় রাখতো সুরভিত।
সে সব গীতি গুঞ্জরিয়া গাইতে আঙিনায়,
তৃপ্তি পেতে অলির মতো, তাতেই হত সায়
ফুরিয়ে যেত দায়।

শ্বাসবায়ুতে আমিই পশি অন্তরে তোমার,
ঘুম ভাঙাতাম তোমার হৃদয়-কুঞ্জে রাধিকার,
পরে খোঁপায় যূথীর মালা রাধার দূতীসমা
একটি পাশে রইত বসে তোমার প্রিয়তমা,
যূথী-বনের রমা।
বর্ণে ছিল স্বর্ণচাঁপা আঙুলগুলি তার,
কিসের গন্ধ বিলাত তা যূথী না চম্পার?
কেশে তাহার বেশে তাহার, তাহার শ্বাসে-হাসে,
ভাষায় তাহার ভূষায় তাহার কিসের সুবাস ভাসে
আজ তা মনে আসে?
তোমার পাশে পোষা কপোত আসত উড়ি-উড়ি,
ডাক্‌ত দূরে থেকে-থেকে ডাহুকী-দাদুরী।
তোমায় ঘেরি চাল গড়ায়ে ঝরত বারিধারা,
তারি ফাঁকে দেখতে ধরায় মায়ায় সালঙ্কারা
ত্রিতাপ দাহ-হারা।
মেঘের ধ্বনির তরঙ্গেতে গগন যেত ভরি,—
দেখছ ঘড়ি? ছিল না ভাই সেদিন কোন ঘড়ি।
পবন, ভুবন, জীবন ছিল মন্থরতায় ভরা,
সহজ ছিল দিনের খেয়া সন্তরণেই তরা,
তরুণ ছিল ধরা।
সত্যি তখন কবি ছিলে, এ যুগ তোমার নয়,
সব ভুলেছ, গীতি লেখাও ভুললে ভালো হয়।
বন্ধু এ কাল আমারো নয়, এ নয় মোদের ঠাঁই,
দেশ বা কালের সঙ্গে মোদের সঙ্গতি যে নাই।
বিদায় তবে যাই।"

তদ্রম্যে রতিঃ

কৃত্তিপট যে এত মনোহর আগে তা বুঝিনি সই ;
ফণী-ফণিনীর ফোঁস-ফোঁসানিতে আর শঙ্কিত নই।
খুলে নেলো জয়া গজমোতিমালা,
খুলেনে কনক-মানিকের বালা।
সাজে না আমায় অঙ্কবলয় আর ফণিমালা বই॥

বিনোদ-কবরী বিনাস্‌নে সই, চাহি না চিক্কনঘটা,
তৈলবিন্দু দিস্‌না এ শিরে, রুখু চুলে হোক জটা।
আলতাকাজল রুচেনাকো আর,
চাহি না উশীর-চন্দনসার।
দেলো দে মাথায়ে শ্মশানভস্ম মুঠো-মুঠো এনে ওই।

ধুতুরাফুলের অবতংসটি রচে দে আমার কানে,
মণ্ডিত কর কটিতট, মহাশঙ্খ-মেখলাদানে।
বৃষভ-ককুদে উপাধান করি
যাপিব লো সখি সুখ-শর্বরী,
করোটিমুণ্ডে প্রেততাণ্ডবে আর চণ্ডিমা কই?

প্রভুর ভূষণে ভীষণ বলিয়া সবে করে পরিহার,
কিবা আছে শিব-সীমন্তিনীর তা হতে কান্ত আর?
প্রেম করিয়াছে বড় সুমধুর
সব রুদ্রতা পরান-বঁধুর,
প্রিয়ের যা প্রিয় শিরে ধরি তাই আজিকে ধন্য হই॥

ষট্‌পদী*

(১)

তার তুল্য বন্ধু নেই যার সঙ্গে নেই পরিচয়,
করে না সে হিংসা মোর, করিতে হয় না তারে ভয়।
কিছুই করে না দাবি, পদে-পদে ধরেনাকো দোষ,
চায়নাকো তোষামোদ, করে না সে অভিমান রোষ।
জানে না লজ্জার কথা, গৃহ-ছিদ্র করে না প্রচার,
করে না বিপন্ন কিংবা অপ্রতিভ, চায় না সে ধার॥

(২)

আঁখি মেলি যাহা পাই তাহা শুধু আলোকের ফাঁকি।
সত্যেরে পাইতে হলে মুদিতে হইবে দুই আঁখি।
আকাশের সত্যরূপ ঢেকে রাখে তপন কিরণে,
রজনীর অন্ধকার প্রকাশিত করে তা ভুবনে।
জ্ঞানে যারে পাইনাকো যা হারাই, ধ্যানে পাই তারে,
দিবসে পাই না যারে, পাই তারে রাতের আঁধারে॥

---

* নির্বাচিত অংশ

(৮)

প্রচণ্ড উদ্যমে শেষে ফলপ্রাপ্তি অবশ্যই হয়।
প্রয়াসে নিঃশেষ শক্তি, অবসাদে স্বাদু তা না লাগে।
ফলের সম্ভোগে আর আগ্রহ উৎসাহ নাহি রয়,
সর্ব রস শান্ত রসে, সর্ব বর্ণ গেরুয়ায় জাগে।
জীবনে সকল জয় গৃহে নয়, শিবিরে, শ্মশানে,
মহাপ্রস্থানের পথে শেষ জয় গৃহ হতে টানে॥

(১১)

মাছে কাঁটা বিঁধে বলি নিরামিষাহারী,
ক্ষুরে গলা ভয়ে বলি রাখিয়াছে দাড়ি।
বাঁচাতে ধোবার ব্যয় গেরুয়া বসন,
পাছে ছেলে হয় ভয়ে অনূঢ় জীবন,
খাটিয়া খাওয়ার ভয়ে মঠে গিয়া বাস
ইহাকেই বলা চলে হিসেবী সন্ন্যাস॥

(১৭)

সত্যই তো এ জীবন পিঞ্জরের পাখি,
নিত্য নব খাদ্য দিয়ে তারে যত্নে রাখি।
তবু সে তো হয়নাকো মোদের আপন
পিঞ্জরে বসি সে হায় কি দেখে স্বপন?
গহন বনেই তার মন পড়ে রয়,
এ বন মরণ ছাড়া আর কিছু নয়॥

(১৮)

নদী বলে, "অমরতা পেতে যদি চাও
বারিবিন্দু, আপনারে আমাতে মিশাও।"
বারিবিন্দু বলে—"আমি তৃণপুষ্পে লভেছি সৌরভ
দু-দণ্ডের মুক্তা আমি—তাই মোর পরম গৌরব।
চাহিনাকো অমরতা মিশি তব জলে
সূর্যকরে চড়ি যাব গগনমণ্ডলে॥"

(২০)

তুমি যবে কাছে ছিলে দেশকালবোধ মম পেয়েছিল লয়।
যেন সে গভীর সুপ্তি অবিদিত-গত-যাম সুখস্বপ্নময়।
তুমি যবে দূরে গেলে নদী, গিরি, পুর, গ্রাম, প্রান্তরের সহ
'দেশ' পুন দিল দেখা দূর ব্যবধান রূপে প্রসারি বিরহ।
কাল সে সহস্র পল অলস অবশ শ্লথ প্রহরের সনে
বুকে চাপে, অনুদিন চিনিলাম কালে পুন দুঃসহ যাপনে॥

আমার দেবতা

আরতি বাদ্যের ধ্বনি দূর হতে সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভেসে আসে কভু ভোর রাতে,
বড়ই মধুর লাগে করি করজোড়
নিঃশব্দে প্রণাম করি দেবতারে মোর।
নগরমন্দিরে যবে ঘড়ি ঘণ্টা কাঁসর ঝাঁঝর,
এক সাথে বেজে উঠে প্রাণ মোর করে ধড়ফড়॥

বড়ই মধুর কান্ত দেবতা আমার
মাধুর্যের সে যে অবতার,
বাঁশরির দেবতা সে, কাঁসরির দেবতা সে নয়।
কুঞ্জের নাগর সে যে, গঞ্জের নাগরে করি ভয়।
যা-কিছু মধুর বিশ্বে তারই মাঝে তাঁরে আমি পাই।
রাজসিক কোলাহলে হট্টগোলে তাহারে হারাই॥

ফুলের জন্ম

লাখো-লাখো যুগ ধরি বিধাতার শ্রম-সাধনার ফলে
যে রূপবীজের জন্ম হল তা পড়ি ধরণীর তলে
অঙ্কুর লভি হল একদিন তরুরূপে পরিণত।
তাহারে সাজাতে কিশলয়দলে কত যুগ হল গত ;
তরু-রূপ হেরি মুগ্ধ বিধাতা। পূর্ণ হল না ব্রত,
তাই অনলস সাধনা চলিল আরো যুগ কতশত॥

সহসা একদা কোরক ধরিল, কুসুম ফুটিল তায়,
বিস্মিত হয়ে নিজ সৃষ্টিতে বিধি তার পানে চায়।
সুষমার পরাকাষ্ঠার পানে মুগ্ধ নেত্রে চাহি,
উল্লাসভরে বিধি উঠিলেন গাহি—

তোমারে সৃজিয়া মোর ব্রত, ফুল, সার্থক করিলাম—
লাখো-লাখো যুগ পরে আমি আজ লভিলাম বিশ্রাম॥

বনভূমি করো আলো,
তোমারে যে ভালোবাসিবে সে জন মোরেও বাসিবে ভালো।
সৃজিলাম আমি সুন্দরতমে ভবে,
তোমারি জন্য আমার এবার মানব সৃজিতে হবে।
দেখে দেখে তোমা শেষ হয় না যে দেখা,
দেখি কত একা একা।
বুঝিবে মানব তুমি ফুল আহা কী যে অমূল্য ধন?
তোমারি অঙ্গে মোর স্বাক্ষর রহিল চিরন্তন।
মুগ্ধ তৃষিত দৃষ্টি আমার তোমাকেই সঁপিলাম।
শুচিসৌরভ হয়ে তা নিত্য স্মরাবে আমার নাম।
চিরসুন্দরে তোমাতেই সে যে পাবে
পশুত্ব তার লুপ্ত হইবে দিব্য সে দেবভাবে॥

ব্যবধান

অস্তগামী সূর্যপানে চাহিয়া চাহিয়া
নাবিক তাহার ক্ষুদ্র কুটিরটি স্মরে।
কুটির-অঙ্গনে স্বপ্ন দেখে তার প্রিয়া
অন্তর তাহার নীল তরঙ্গে সন্তরে।
দুইজনে দু-হাজার ক্রোশ ব্যবধানে
অবিচ্ছিন্ন কিন্তু তারা প্রেমে মনে প্রাণে॥

ত্রিরত্ন

এল দিগ্‌জয়ী দিগ্‌গজ বীর পণ্ডিত ব্রজধামে,
যেন রণমদে মত্ত দন্তী পঙ্কজবনে নামে।
অশ্বমুণ্ডে উড়ায়ে ঝাণ্ডা চারণ ফুকারি চলে,
চতুর্দোলায় পণ্ডিত দোলে বিজয়মাল্য গলে।
জয়নাদ তুলি অনুচরগুলি চলে তার পাছে-পাছে,
ভয়ে সবে পুঁথিপত্র গুটায়, কেহ না আগায় কাছে।
রূপ-সনাতন রহেন দু-জন সাধনভজনরত,
কে আসে কে যায় ব্রজে তার খোঁজ রাখেন না অতশত।
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহাদের রটিয়াছে সারা দেশে,
বিচারমল্ল তাই শুনি আজ অভিযান করে শেষে।
দুই ভাই ব্রজে প্রেমাবেশে মজি বিভোর আছেন সুখে,
'যুদ্ধং দেহি' হাঁকিয়া দাঁড়াল সে তাঁদের সম্মুখে।
পরমাগ্রহে মৃদু হাসি দোঁহে বসাইয়া সমাদরে,
বিজয়পত্রী লিখিয়া দিলেন জয়-ভিখারির করে।
বিজয়গর্বে তূর্য বাজায়ে পণ্ডিত যায় ফিরে,
সূর্য তখন মাথার উপরে উঠিতেছে ধীরে-ধীরে।
পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে দুধারে দাঁড়ায় সরি,
সিক্তবসনে শ্রীজীব তখন ফিরিছেন স্নান করি।
সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনি সে আস্ফালন--
'বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন!'
শুনি শ্রীজীবের ধৈর্য টলিল, বলিলেন "পণ্ডিত
এসো, আমি দিব দম্ভের তব প্রতিফল সমুচিত
যাঁদের কুঞ্জে তুমি দিগ্‌গজ করেছিলে অভিযান,
তাঁদের আমি তো চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান ;
পেয়েছি তাঁদের জ্ঞানসাগরের শুধু এক অঞ্জলি,
মোরে জিনে তবে জয়গৌরবে ব্রজ থেকে যাবে চলি।"

তরুণ কণ্ঠে শুনি অকুণ্ঠ, রণে আহ্বান-বাণী
অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী ;
বলিল, "মূর্খ, কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র শশকে বধে?
পারাবার পার হয়ে এসে শেষে ডুব্‌ব কি গোষ্পদে?"

বাহকবৃন্দে বলিল সে, "চল্, কেন রয়ে গেলি থেমে।"
জীব বলিলেন, "তিষ্ঠ কেশরী, দোলা হতে এসো নেমে!"
তর্ক বাধিল যমুনার তীরে—দলে-দলে সেথা আসি
দুই মল্লেরে দাঁড়াইল ঘিরে কুতূহলী পুরবাসী।
হানিতে লাগিল পণ্ডিত যত শাণিত প্রশ্নবাণ,
হেলায় সে-সব করিলেন জীব খণ্ডিত খান-খান।
দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক,
শুনিতে পাইল জনতায় শুধু ধ্বনিতেছে "ধিক্-ধিক্"।

অবনতশিরে বিতণ্ডাবীর পাণ্ডুর মুখে ধীরে
ধবজা গুটাইয়া সোজা পলাইল মথুরার দিকে ফিরে।
ব্রজবাসিগণ শুভসংবাদ ভাবি, পুলকিত মনে
জানাল এ কথা—বিজয়-বারতা—রূপ আর সনাতনে।
সিক্ত বসন শুকায়েছে গায়, তৃতীয় প্রহর বেলা,
আরো দেরি হল ফিরিতে জীবের ঠেলি জনতার মেলা।
কুঞ্জে তখনো গ্রহণ করেনি কেহই অন্নজল,—
বলিলেন রূপ, "জীব, পিছে তব এত কেন কোলাহল?
শুচি হয়ে আজ আসো নাই তুমি স্নান করি যমুনায়,
যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়।
মুখদর্শন করিব না তব—বৃথা তোমা পালিলাম,
রাজসভা তব সুযোগ্য ঠাঁই, নহে এই ব্রজধাম।"
চরণে পড়িয়া শ্রীজীব কতই করিলেন অনুনয়,
রূপের হৃদয় গলিল না তায়, কোপের হল না ক্ষয়।

শ্রীজীব তখন যমুনার তীরে তমাল-তরুর তল
আশ্রয় করি রহিলেন পড়ি ত্যজিয়া অন্নজল।
সকল সময় চোখে ধারা বয়, ফুলে-ফুলে উঠে বুক,
শ্রীহরির নাম জপে অবিরাম বসনে ঢাকিয়া মুখ।
শ্রীজীবের দশা দেখে সনাতন মর্মে পেলেন ব্যথা,
করিল কাতর তাঁর অন্তর শ্রীজীবের কাতরতা।
বিরূপ শ্রীরূপে কহিলেন চুপে, "শ্রীজীবে ত্যজিলে কেন?
বৈষ্ণবগুরু হয়ে তব কেন বিকৃত বুদ্ধি হেন?

গুরুমর্যাদা রক্ষা করাই ছিল তার মনে সাধ,
আমি তো দেখি না এর বেশি কিছু গুরুতর অপরাধ।"
রূপ কহিলেন, "বুঝাবার ভাই আছে কিছু প্রয়োজন?
হয়ে বৈষ্ণব জ্ঞানের গরব করেনি সে বর্জন।
তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হতে দীনতর
সেই বৈষ্ণব,—জয়গৌরব ভাবে না সে কভু বড়ো!
গুরুমর্যাদা?—হায় অদৃষ্ট! গুরুরেও সে না চিনে,
এত উপদেশে হল হায় শেষে এ শিক্ষা এতদিনে।"

শুনি সনাতন মৃদু হেসে কন, "বর্জিতে অভিমান
পারে নাই জীব, এখনো বালক, আমাদেরি সন্তান।
তুমি তার তাত, তুমি গুরু, ভ্রাতঃ, পারিলে না আজো হায়,
বৈষ্ণব হয়ে রোষ বর্জিতে — দোষ কিছু নাই তায়?
সেই অছিলায় ত্যজিব তোমায়? দীনতার অভিমান—
তাও অভিমান, বৈষ্ণব-মনে তাও পাবে কেন স্থান?
সেই অভিমান থাকে যদি মনে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণব মোরা নই ;
জীবে দয়া তব পরম ধর্ম, 'জীবে' দয়া তব কই?
নিমাইয়ের দান বিনয়-দৈন্য নিতাইয়ের দান ক্ষমা,
দৈন্যই হন যদি নারায়ণ ক্ষমা যে তাঁহার রমা।"

একথা শুনিয়া চমকি উঠিয়া রূপ কহিলেন কাঁদি—
"কী কথা শুনালে? হায়, তার চেয়ে আমিই তো অপরাধী!"
বৈষ্ণব হয়ে ক্ষমা করিতে তো পারিনি সুসন্তানে,
না বুঝে অশনি হেনেছি জীবের কুসুমকোমল প্রাণে!
যাও ভাই যাও, এক্ষনি গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো তারে,
না জানি কত-না পায় সে যাতনা এ মূঢ়ের অবিচারে।"

সনাতন-সাথে শ্রীজীব এলেন, কঙ্কালসার দেহ,
অরুণ নয়ন, ছিন্ন বসন, চিনিতে পারে না কেহ।
জীবে বুকে ধরি কাঁদিলেন রূপ অবুঝ শিশুর মতো,
বার-বার তার ললাট চুমিয়া জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত।
চারি চক্ষুর ধারায় তিতিল বৃন্দাবনের রজ,
শুচি হল তায় দিগ্‌বিজয়ীর পরশে অশুচি ব্রজ।

উমা ও মেনকা

উমারে রাখিয়া বুকে চুমা দিয়া চাঁদমুখে
গিরিরানী কেঁদে-কেঁদে কয়,
"মা তোরে বিদায় দিতে কাতর-আতুর চিতে
সদা ভয় কি যেন কি হয়।
ভিখারি হরের ঘরে কি করিয়া অনাদরে
অযতনে কাটে তোর দিন!
তৈল বিনা তোর কেশ হৈল রুখু, ছিন্ন বেশ,
জটাধারী সদা উদাসীন।
যাস্‌নে মা মাথা খাস্ তাই নে মা, যা-যা চাস্,
এই বুকে থাক্ চিরকাল,
ভারি-তো সংসার তোর পালিতে কি ক্লেশ মোর?
ফলভারে ভাঙোনাকো ডাল।"
আপন আঁচল দিয়া মার চোখ মুছাইয়া
মার মুখ ঝাঁপি উমা কয়—
"শুনিলে এমন কথা মনে বড় পাই ব্যথা
হেন ভাগ্য যেন না মা হয়।
বিফল ও-ফলভার কি ফল তা বহিবার?
বিফল যে ফলের জীবন।
দেবতার ভোগে-রাগে সেবায় যদি না লাগে,
যদি তা না কর নিবেদন।
তুমি তো জানো মা নিজে নূতন বলিব কি যে,
তরুলতা কেন ফল ধরে?
ফলাবার অধিকার আছে মাগো মা তোমার
ফল শুধু সঁপিবারই তরে।"

অম্বপালী

বৈশালী-পথে ছুটেছে বিবিধ যান,
রথ টানি চলে ধনিকগণের অশ্বেরা বেগবান্,
ধুলায় ভরিল পথ,
সবারে ছাড়ায়ে অম্বপালীর রথ
দাঁড়াইল নিজ আম্রকাননে পশি,
সংঘের সনে যেথায় সুগত বুদ্ধ আছেন বসি।

করজোড় করি কহিল অম্বপালী—
"আমার আগারে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন প্রভু কালি।"
ধনী নাগরিকগণ
একে-একে সবে করিল নিমন্ত্রণ।
কহিলেন প্রভু—"তোমরা এসেছ পরে,
ভিক্ষা তো আমি স্বীকার করেছি অম্বপালীর ঘরে।"
পৌর-বৃদ্ধ কহিল নোওয়ায়ে শির,
"অম্বপালী তো কুলশীলে হীনা গায়িকা বৈশালীর!
আম্র বেচিয়া ধনবতা হল।" তুলি দক্ষিণ পাণি
বুদ্ধ হাসিয়া কহিলেন—'তা তো জানি!'
শুধু এই বলি নীরব শাক্যমুনি।
পুরবৃদ্ধেরা করি প্রতীক্ষা আর কিছু নাহি শুনি
ফিরিয়া নগরে অম্বপালীর ভবনে হইল জড়ো,
বলিল তাহারা,—"আম্রপালিকা, স্পর্ধা তোমার বড়!
থাকিতে শতেক মান্য পৌরজন
সাহসিকা, তুমি করিলে কেমনে সুগতে নিমন্ত্রণ?
আমরা সকলে এলাম তোমার কাছে,
প্রত্যাহারের এখনো সময় আছে।"

কহিল সে নারী "অন্য লালসা নাই,
কালি শুভদিনে প্রভুরে আমার চাই।"
পৌরগণের সভায় তখন হইল নির্ধারিত
অম্বপালিকা নগর হইতে হইবে নির্বাসিত!
তাহার ভবন তাহার আম্রবন
পৌরগণের হবে সাধারণ ধন।

প্রভাতে জাগিয়া স্নান করি শুচি সেবিকা অম্বপালী
প্রভুর লাগিয়া রন্ধন করে নূতন চুল্লি জ্বালি।
যথাকালে প্রভু আসিয়া তাহার ঘরে
পদ প্রক্ষালি বসিলেন পীঠ 'পরে
অম্বপালিকা কেশরাশি দিয়া মুছাল চরণ তাঁর
তারপর দিয়া শতাধিক উপচার,
বিবিধ ভোজ্য আনি
প্রভুর সমুখে রাখিল যতনে স্বর্ণপাত্রখানি;
ব্যজন করিতে-করিতে কহিল—"স্বামি,
আমার প্রাসাদ আম্র-কানন দক্ষিণা দিনু আমি।

একটি ভিক্ষা আছে,
প্রভু আপনার কাছে—
পুত্র আমার দিয়াছে সংঘে যোগ
আমি করিতেছি অতুল বিভব ভোগ,
এ যে নিদারুণ নিগ্রহ প্রভু, তুমি অকরুণ নও।
বিষ হতে মোরে অমৃতে তুলিয়া লও।"

কহিলেন প্রভু, "সময় না হলে বৃথা হয় আবেদন,
সময় হয়েছে বলেই স্বীকার করেছি নিমন্ত্রণ।
ভেঙেছে মায়ার বেড়ি,
উপসম্পদা দিলাম তোমায় তুমি হলে মহাথেরী।"

পৌরবৃন্দ রোষভরে যারা দিয়াছিল গালাগালি,
দেখিল তাহারা বুদ্ধের পিছে চলে সে অম্বপালী
মুণ্ডিত শিরে কাষায় বসনে হস্তে দণ্ড ধরি।
লক্ষ কণ্ঠে বুদ্ধের জয় উঠিল নগর ভরি।
দূর করিবারে চাহিল সকলে যাহারা নগর থেকে,
আপনিই দূর হয়ে যায় সে যে লজ্জিত হয়ে দেখে।
বুদ্ধের কৃপা চাহিল যাহারা ভোজন-আপ্যায়নে,
সুলভে যে তাহা মিলে না, তাহারা বুঝে আজ প্রাণে-মনে
জাতি-কুল ব্যবসায়
দিব্যধনের অধিকার-লাভে হয় না অন্তরায়।

পল্লীসন্ধ্যা

স্বপন দেখে বসি তপন রাঙা পাটে
ফুরালো বেচা-কেনা গাঁয়ের ভাঙা হাটে.
বাথানে ফিরে ধেনু বাজিছে সাথে বেণু
বাতাসে পথরেণু উড়িছে বাটে-বাটে,
গাগরি ভরা শেষ দিঘির ঘাটে-ঘাটে॥

কলসি লয়ে কাঁখে ফিরিছে বধূ ঘরে
পেউনি হতে তার মমতা-মধু ঝরে।
কমল দল রুধি ঢুলিয়া পড়ে মুদি
কুমুদী আঁখি মেলে তড়াগে থরে-থরে।
দেউটি ওঠে জ্বলে গাঁয়ের ঘরে-ঘরে॥

করিয়া সেঁচা শেষ কৃষাণ প্রান্তরে,
ধুইতে কাদামাটি পুকুরে স্নান করে।
কৃষাণী চালাঘরে অন্নে থালা ভরে।
বাছুর ছাড়া পেয়ে অমৃত পান করে।
বাউলতলে বসি বাউল গান ধরে॥

আহার ঠোঁটে পাখি তাহার নীড়ে ফিরে,
খাওয়াতে শাবকেরে জাগায় ধীরে-ধীরে।
মলিন কাঁথা পাতা উঠানে বসে মাতা
শিশুরা গায় গাথা তাহারে ঘিরে-ঘিরে,
দুলায় চুলগুলি বাতাস ঝিরঝিরে॥

বকম-বকম কূজে কপোত অবিরল।
নকল করে এই শিশুরা অবিকল।
দেউলে বাজে খোল, খামারে বাজে ঢোল,
'কবির গানে' মাতে সখের কবিদল,
ভাঙে দারু পিয়ে কণ্ঠে লভি বল॥

ছাগল-শিশুটিরে কে নাম ধরি ডাকে?
তুলি সে লয় কোলে আদর করি তাকে।
শিয়াল আখঝাড়ে পহিলা ডাক ছাড়ে,
হাঁসেরা খোপে ফিরে ঘুমাতে ঝাঁকে-ঝাঁকে;
বিদায়-দিবসের ঘোষিত শাঁখে-শাঁখে॥

ঠাকুরমা

কত গাড়ি থামছে দরজায়
সাঁঝবেলাতে জ্যেঠার গাড়ি থামে,
ঠাকুরমা তো কোনটাতেই নাই.
একটা হতেও ঠাকুরমা না নামে॥

তোমরা বলো হাসপাতালে গেছে
কদিন পরে আসবে ফিরে বাড়ি.
তাই যদি হয় তবে কেন দাদু.
আমার দু-চোখ কাঁদনে হয় ভারি॥

আমার মনে হল কি শোন. দাদু.
আসল কথা তোমায় আমি বলি—
ঠাকুরমা মোর আসবেনাকো ফিরে,
রাগ করে সে গেছে কোথায় চলি॥

কেন জান? দুষ্টু বড় আমি
পড়াশুনায় দিই না আদৌ মন,
নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া নিয়ে সদাই
মা-বাবাকে করছি জ্বালাতন॥

দেখা পেলে বলো ঠাকুরমাকে
দিচ্ছি আমি কালী মায়ের কিরে—
দুষ্টুমি আর করবোনাকো দাদু,
ঠাকুরমা মোর আসলে আবার ফিরে॥

ক্ষুদ্র নবাব

একটি মাত্র ক্ষুদ্র নবাব,
খেয়ালি একরোখা স্বভাব,
তারি দাপে ভুবন কাঁপে
করছে টল্‌মলো।
ভাঙছে এটা, ছিঁড়ছে ওটা,
রাখছে না সে কিছুই গোটা,
ছড়িয়ে খাবার কাকা-বাবার
হাসছে খলখল॥

মা এসে তায় বকলে পরে
ছুটে পালায় দাদুর ঘরে,
দাদু বলে, বকছ কেন
কী ক্ষতি বা করছে?
ওর চেয়ে যে অনেক ক্ষতি,
তোমরা কর, গুণবতি,
প্রতি মাসেই মেরামতি
অনেক খরচ পড়ছে॥

গোঁফ ছিঁড়ছে দাদুর বুকে,
নস্যি গুঁজে দিচ্ছে মুখে,
উল্টে দোয়াত কালি ঢেলে
দিচ্ছে লেখায় তাঁর।
দাদু বলে, ঢালছ ঢালো,
লেখা হবে এতেই ভালো।
নতুন করে লিখতে গেলেই
হয় তা চমৎকার॥

শিশুর সংকল্প

সকালে উঠিয়া আমি মনে-মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
যাহা পাই তাহা খাই সোনামুখ করি
মার দেওয়া খাবারের দোষ নাহি ধরি॥

কইব না, এটা কই ওটাই বা কই?
কোথায় হালুয়া-ছানা কোথা ক্ষীর-দই?
ডাল-রুটি খাব না মা বলিনাকো যেন,
ঝোলে শুধু কাঁচকলা মাছ নেই কেন?

বলিনাকো যেন খাব লুচি ঘিয়ে ভাজা,
চানাচুর শুধু কেন কোথা গজা-খাজা।
বলি যেন বড়ি ভালো চাই না মা বড়া।
গুড়ের লাড়ুই ভালো তিতো রসকরা॥

যাহা পায় তাই খায় শুনেছি গোপাল
গোপালের মতো হব হব না রাখাল।
শুনেছি ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া
যাহারা বিচার করে রাখাল তাহারা॥

দিন ফুরানোর গান

চিন্তা কি আর দিন তো এল ফুরিয়ে।
ক্ষতিলাভের হিসাব এখন দিই তুড়িতে উড়িয়ে।
অস্ত রবির বিদায় কিরণ
ছড়ালো শেষ মুঠার হিরণ,
ছন্দপুটে বন্দী করে যাচ্ছি রেখে কুড়িয়ে॥

বলাকারা ধায় অসীমে পাখছানিতে যায় ডেকে,
মনের ডানার ছটপটি সার উড়তে সে চায় তাই দেখে।
দিগন্তের ঐ সন্ধ্যামণি
পাঠায় রঙিন আমন্ত্রণী,
দূর সাগরের উদাস হাওয়া তপ্ত হৃদয় দেয় জুড়িয়ে॥

নেই কোন যান চলার পথে, সবার এ পথ হয় হাঁটিতে,
লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটি খেয়ানায়ের পারঘাটিতে।
বনের পাখি গায় পূরবী,
কয় তারা 'ভয় কিসের কবি?'
ছায়ায়-ছায়ায় পায়ে-পায়ে শুকনো পাতা যাই গুঁড়িয়ে॥

ধ্যানের চেয়ে জ্ঞানের চেয়ে কাজের চেয়ে কথার সার
ভেবেছিলাম, খেয়ার পথে কথাই এখন লাগছে ভার।
চাই যে এখন নীরবতা,
ফুরিয়ে এল আমার কথা,
কালের রাখাল ছাড়ল ধেনু, নটে গাছ সে খায় মুড়িয়ে॥

আবাহন

এসো এসো সখা মন্দির তলে
দুয়ারে করো না দেরি।
মিলিব আজিকে মরালের মতো
বাণীর চরণ ঘেরি॥

হৃদয়কণিকা কুঞ্চিত যত,
ফুটায়ে তুলিব কমলের মতো,
করিবে জননী আশিস বরষ
করুণানয়নে হেরি॥

হইবে নিভৃত ভাবের বদল
মধুর গন্ধ-সম।
গভীর প্রণয় সুষমার মতো
কমলে উজ্জ্বলতম॥

মিল হে বন্ধু মধুর বন্ধে,
বাজাও তন্ত্রী পুণ্য ছন্দে,
আজিকে দেউল তোরণের 'পরে
বাজে আহ্বান ভেরী॥

মরণের পরে

জীবনের দিন শেষ হয়ে এল, আজও নাহি জানিলাম,
মরণের পরে কোথা যায় লোক, কি তাহার পরিণাম!
একটিও লোক পরলোক হতে আজো আসিলানা ফিরে,
কারে জিজ্ঞাসি? বৃথাই শুধাই সাধু দরবেশ পীরে॥

সাহিত্য সেবা

সাহিত্যসেবীর দেশে হবে না অভাব,
নগদ বিদায় যাহা পাও ভোগ কর তাহা।
সাহিত্যসেবার জেনো সেইটুকু লাভ॥

স্বার্থ

খাটছি কেন জানতে চাও, স্বার্থ কিছু নেই,
অভাব কিছু নেইকো আমার প্রাপ্য কিছু নেই।
থাকতে বেঁচে কেমন করে দেশটা দেখি হচ্ছে মাটি,
ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে কেবল আমি যাচ্ছি খাটি॥

বিলাস

মানুষে-মানুষে কোন ছিল না তফাৎ
হাসিমুখে পরস্পরে মিলাইত হাত।
বিলাস আসিয়া ভেদ করিল সৃজন
পর হয়ে গেল হায় যে ছিল আপন॥

আত্মরক্ষা

বেড়াল মারতে এলে চোখ বুজে থাকে,
দেখিতে পায় না আর নিজ দেহটাকে।
ভাবে সে অস্তিত্ব তার লুপ্ত তায় বুঝি,
দাণ্ডাধারী তারে আর পাইবে না খুঁজি॥

দু-দণ্ডের মুক্তা

নদী বলে, অমরতা পেতে যদি চাও,
বারিবিন্দু আপনারে আমাতে মিশাও।
বারিবিন্দু বলে, আমি তৃণপুষ্পে লভেছি সৌরভ,
দু-দণ্ডের মুক্তা আমি তাই মোর পরম গৌরব॥

সৃষ্টির পরিণাম

কার তরে কর বন্ধু শ্রমজল পাত,
যাহারা আসিবে পরে
তাহারা যে বৈশ্বানরে,
করিবে তোমার সৃষ্টি সবি ভস্মসাৎ॥

উচ্চাশা

ইঁদুর বলে বয়স হলে আমিই হব হাতি,
দুর্বা বলে বংশ হব, আমি তো তার নাতি।
রুই-কাতলা যা হোক হব কয় পুঁটিমাছ হেঁকে।
গুগলি বলে শঙ্খ হব হুগলি গাঙেই থেকে॥

কাব্য লেখক

সভ্য তুমি, ভব্য তুমি, কাব্য লেখক নব্য,
সারা দেহ দিব্য শুচি, মাথায় শুধু গব্য।
পাংশুলভ্য দ্রব্য কিছু নহে তোমার লভ্য,
ইহা ছাড়া নাই কিছু মোর তোমারে বক্তব্য।

পুণ্য বাণী

বিশ্ব চরাচরে
সর্বদেশে সর্বযুগে মানুষের তরে
উদ্‌গীত হইয়া গেছে তব পুণ্য বাণী।
হায় রে না জানি
কতদিনে মানবমণ্ডলী—
তাহাদের ভ্রান্তি, মোহ, দ্বেষ, দ্রোহ দিয়া জলাঞ্জলি
চিনিবে সে পুন সত্যে ঘোষণা করিলে তুমি যার,
জানিবে সে যত শুদ্ধ অনুষ্ঠান আচার-বিচার
ধর্ম নয়, কল্যাণের পথ হতে ঘটায় বিচ্ছেদ
মানুষে-মানুষে শুধু রচিয়া প্রভেদ ॥

কতদিন জানিবে সে হিংসা দম্ভ লোভ,
শান্তি দিতে নাহি পারে, জাগায় বিক্ষোভ,
নিত্য নব হত্যার মড়কে
স্বর্গতুল্য বিশ্বভূমি পরিণত করিছে নরকে ॥

কত দিনে দূর হবে পাপ গ্লানি আবর্জনা জমা,
কত দিনে জানিবে সে ধর্ম শুধু মৈত্রী, ত্যাগ, ক্ষমা।
হে মহামানব,
তব তপ ব্যর্থ হবে ইহা কি সম্ভব?

মহামানব

শুনিয়াছি চিরলুপ্তি, স্বর্গ, মুক্তি, নরকের কথা,
হে সুগত, শুনাইলে তুমি শুধু আশার বারতা।
বুঝিলাম, না হইলে ধ্বংস কামনার,
জন্মপথে এ জগতে আসিতে হইবে বার-বার।

আশ্বস্ত করিলে শাস্তা, মৃত্যু নেই মোর,
ছিন্ন কভু হইবে না ধরণীর সাথে বাঁধা ডোর।
ভালোবাসি যে ধরারে আসিব তো সেথা ফিরে-ফিরে
পশু হই, পক্ষী হই, হই ব্যাধ পাতার কুটিরে॥

দুঃখালয় অশাশ্বত জানি এই ধরা
জরা মৃত্যু পাপ তাপে ভরা,
তবু তারে ভালোবাসি। নাই মোর শীলের সাধনা,
'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' বাড়িছে কামনা,
তোমারি লভিতে যাহা লাগে কোটি যোগিজন্ম, প্রভু,
জানি তাহা—সে নির্বাণ-এ ভোগীর লভ্য নয় কভু।
শুনাইলে আশারই সংবাদ
আয়ত্ত হইবে মোর বহু নব জীবনের স্বাদ।
জন্মধারা নাহি করে যদি কভু অবসান লাভ
অসংখ্য জন্মের মোর চিন্তা, চেষ্টা, স্বপ্ন, অনুভাব—
যত তুচ্ছ হোক তাহা পুঞ্জীভূত হইল সকলি
অবজ্ঞাত হইবে না কভু তুচ্ছ বলি॥

অঙ্গীভূত হয় যদি মানুষের জীবনধারায়
কামনার দণ্ড মোর পণ্ড ব্যর্থ হইবে কি তায়?
আশ্বস্ত করিলে শাস্তা, তোমার নির্বাণ
তোমারি থাকুক প্রভু, চাইনাকো আমি অবসান॥

বুদ্ধগয়ায়

হে বুদ্ধ, মন্দিরে তব দাঁড়াইয়া আমি যুক্তপাণি
শুনিতেছি ধ্বনিতেছে চিরন্তনী তব শান্তি বাণী।
শান্তি-শান্তি! শান্তি মাঝে বিরাজিছে সত্য চিরন্তন,
ভ্রান্তি-ভ্রান্তি বাকি সবি, অশান্তিই অসত্য স্বপন।
শান্ত হয়ে কর চিন্তা, শান্ত রও উৎসবে ব্যসনে,
শান্ত হয়ে কর ভোগ, শান্ত হও ব্রত উদ্‌যাপনে,
শান্ত হয়ে লও ধীরে নতশিরে খ্যাতি বা সম্মান,
অপ্রমত্ত হয়ে ভুঞ্জ, শান্ত চিত্তে সৌভাগ্যের দান॥

শান্ত হও বাক্যে কর্মে, শুদ্ধতায় শক্তির সঞ্চয়,
ক্রুদ্ধতায় ক্ষুব্ধতায় লুব্ধতায় জীবনের ক্ষয়।

শান্ত চিত্তে বরি লও সর্ব দুঃখ, সর্ব লজ্জা ভয়
অটল শান্তির কাছে নিয়তির নিত্য পরাজয়।
প্রশান্তির বিনিময়ে কেহ কভু নয় লাভবান,
গভীর শান্তির মাঝে চিরতরে লভ অবসান॥

জন্মান্তর

জাতক কাহিনীগুলি পড়িতে-পড়িতে, অকস্মাৎ
সহসা মুদিয়া এল স্বপ্নভরে নয়নের পাত,
জাতিস্মর দৃষ্টি মোর চলে গেল যুগযুগান্তরে।
একি দেখি! পুড়িতেছি শত-শত চিতার উপরে।
আমারি সহস্র শব নানা বয়সের সরি-সারি
চলিয়াছে পথ দিয়া, বন্ধুজন কাঁদিছে ফুকারি॥

কত জনে কাঁদায়েছি যুগে-যুগে জন্ম-জন্মান্তরে,
কত সুখ সংসারের রচিয়া তুলিয়া নিজ করে
চূর্ণ করি গেছি চলি। সুখস্বপ্ন করি দিয়া দূর
কত কচি বুকে হায় হানিয়াছি অশনি নিষ্ঠুর।
তাদের বেদনা আজ আকুলিয়া তুলিতেছে বুক,
কত মাতা, কত ভ্রাতা লক্ষ-লক্ষ শোকম্লান মুখ
মোহমুগ্ধ মায়া মূঢ়, গণ্ড বেয়ে ঝরে অশ্রুধারা,
কত শত জনমের শত-শত প্রিয়জন তারা,
সন্তানসন্ততি কত ; জাতি ধর্ম, ভূষা, আচরণ,
—কতই বিচিত্র! তবু চিনে মোর জাতিস্মর মন॥

পিতা হয়ে, পুত্র হয়ে কত ঘরে গড়েছিনু ঠাঁই,
অবাক হইয়া ভাবি চারিদিকে যত আমি চাই,
তাহাদেরি বংশধরে দেখি আজ ভরেছে ভুবন
মহামানবের মাঝে কেবা নয় আমার আপন?
তাই আজি মনে হয়, ঘেরি মোর এ জীবন্ত শব
একান্ত আত্মীয় হয়ে ঘিরে আছে নিখিল মানব॥

বাণীবন্দনা

নবজীবনের সঞ্চার করি
        আমার বক্ষে এসোমা বাণী
করি শীতান্ত নব বসন্তে সঙ্গে আনি।
        জড়তা হরিয়া মূঢ়তা হরিয়া
        জ্ঞানের আলোকে ভুবন ভরিয়া
দ্যুলোক ভূলোক মুখর করিয়া
        রাজুক তোমার ও বীণাপাণি

রচনাকাল ১৯৪৫

আততায়ীর প্রতি

আঘাত হানিলে ক্রূর   করিলে বেদনাতুর
        এ বেদনা ভোলা সুকঠিন
এ ব্যথাও ভুলে যাবো   তুমি যাই মনে ভাবো
        এর স্মৃতি রবে কিছুদিন।
মাতা ভুলে পুত্র শোক   সব ক্ষতি ভুলে লোক
        কাল ক্ষতে শ্রী পাণি বুলায়
দাবানলে ভুলে থাকি   বাসা গড়ে পুন পাখি
        ভোলানাথ সকলি ভুলায়।
তোমার পাষাণ হৃদি   গলাইয়া দিবে বিধি
        তুমিই করিবে হায় হায়
অনুতাপে হবে বোঝা   তোমারি হবে না সোজা
        এ আঘাত ভোলা হবে দায়।

রচনাকাল ১৯৪৬

বর্ষার গান

(১)

[আষাঢ়]

বাতাস বহে এলোমেলো পাগলা তাহার বেগ,
রবিহারা দিবস বিবশ, হাঁকছে কালো মেঘ।
মাঝে-মাঝে পসলা ধারা নামে,
হাজার পাখি ডেকে ওঠে বাদলা যখন থামে।
নিঝুম সারা পাড়া,
পথে কেউই বেরোয়নি আজ এক ভিখারি ছাড়া।
মাঝে-মাঝে চিকুর হানে চোখে লাগায় ধাধা,
দূরে দেখি নদীর চড়ায় নৌকাগুলি বাঁধা।
জানালা পাশে বসে আছি, উদাস আমার মন:
কত কথাই মনের মাঝে জাগছে সারাখন।
মনে পড়ে বাবার আঁখি কাতর জলভারে
দূর বিদেশে গেলাম যখন এমনি আষাঢ়ে।
মনে পড়ে ঘুমহারা সেই মায়ের আঁখি লাল,
কঠিন রোগে কাতর যখন ছিলাম কিছুকাল।
মনে পড়ে দিদিরে মোর যেদিন বিয়ের পরে
আঁচলে চোখ চেপে কেঁদে গেল শ্বশুর ঘরে।
মনে পড়ে পুতুল ভেঙে ফেলে
খোকন কবে কেঁদেছিল পা-দুটি তার মেলে।

(২)

[শ্রাবণ]

শাওন এল তোমার শোকে হাজার চোখে সলিল ঢেলে,
হৃদয়ে কবি নামিয়া এসো মেঘের বাধা চরণে ঠেলে।
মরণে কবি করেছ জয়,
বরণে তাই করি না ভয়,
কদম-সম উঠিবে তনু শিহরি বুকে তোমায় পেলে ॥
ভুবনখানি নবীন করে
জীবনে প্রেমে গেলে যে গড়ে
যাহারে এত বাসিতে ভালো কোথায় গেলে তাহারে ফেলে?
সেথায় হেন জুঁই কি ফোটে সুবাস ঢালে বনের কেয়া?
সেথায় হেন বিজলি নাচে মাদলে গায় বাদল দেয়া?
ফিরিয়া এসো শ্রাবণ রাতে
বাঁশিটি তব আনিও সাথে
এমন দিনে পরের দেশে থাকে কি কবি ঘরের ছেলে?

(৩)

[ভাদ্র]

বরষার রূপ দেখিতে পাই না নগরের জানালায়,
মনটি আমার গাঁয়ের মাঠের আলপথ পানে ধায়।
চাল হতে জল হাজার-ধারায়
ঝালরের মতো হেথা না গড়ায়,
তারি ফাঁক দিয়ে আসল রূপটি দেখিবারে সাধ যায় ॥
পথ দিয়ে হেথা চলে জনধারা ছুটে না তো জলধারা,
হেথায় কাজলা দিঘির ঘাটটি হয় না সোপানহারা।
কপোত এখানে ঘরের সাঙায়
বরষা রাতির ঘুম না ভাঙায়,
ভিজে পাখা ঝেড়ে চড়ুই এঘরে অতিথি হতে না চায় ॥
মেঘের ডাকেরে করে না দাদুরী উপহাস সারানিশি,
হয় না কদম জুঁই কামিনীর সুবাসের মেশামিশি।
খেতভরা জলে মাথা তুলি-তুলি
নাচে না হেথায় ধান গাছগুলি
বরষা তো কালো গাঁয়ের দুলালি হেথা না মানায় তায় ॥

জনশিক্ষা। দশমবর্ষ, ১৯৫৯

কাম্য মরণ

মরিতে চাহিনা আমি ব্যাধির শয্যায়
তিলে-তিলে ভুগে আর ভোগায়ে সবায়
মরিতে চাহিনা আমি দুর্ঘটনায়
অগ্নিদাহে কিংবা কোন যানের তলায়
মরিতে চাহিনা আমি হয়ে গলগ্রহ
অক্ষম অপটু হয়ে মরণ দুঃসহ
মরিতে চাহি না আমি কোনরূপ বিষে
খাদ্যবস্তু-সহ যাহা গুপ্ত রয় মিশে
হার্টফেল করে যেন নিমেষে মরি
এক ডুবে বৈতরণী নদীটিরে তরি ॥

রচনাকাল ১৯৬২

বার্ধক্য

বাঁধা দাঁত ছিল তাও ভেঙে গেল
চিবাইবো কিসের খাদ্য
পান ছেঁচে খাই, মুড়ি চিড়ে ছোলা
গুড়া করে খেতে বাধ্য।
সকল চমশাই অচল হয়েছে
হারায়ে ফেলেছি দৃষ্টি
বন্ধ হয়েছে লিখন পঠন
বন্ধ সকল মিষ্টি।
আধেক মাথা দুই রঙা চুল
অর্থাৎ সবই পক্ক।
আধেক তাহাতে পড়িয়াছে টাক
অর্থাৎ কিনা টক্ক।

রচনাকাল ১৯৬২

প্রাচীনা

যাদের কথা লিখে গেলাম নেইকো আজি তারা,
তাদের ধারা হয়ে গেছে কালসাগরে হারা।
কান্না-হাসি ভয় ভরসায় আশায় আকাঙ্ক্ষায়
শহরে নয়, তাদের জীবন কাটল পাড়াগাঁয় ॥
তাদের নাতি-নাতনীরা সব অগ্রগতির পথে
বিহার করে এই শহরের বিশাল ইমারতে ॥
নব যুগের মহিলাদের সাথে
তফাৎ তাদের ঘটল অনেক জীবনযাত্রাতে।
এ যুগের এই মলয়া প্রলয়া
তাদের কথা শুনলে এদের জাগবে মনে দয়া।
তবু তারা চিরন্তনী নারী—
পুরুষালির অধিকারে পায়নি দখলদারি ॥
ভোজ্য ভূষা, ভঙ্গি ভাষা, আচার অনুষ্ঠান
তাদের সাথে গড়ল এদের অগাধ ব্যবধান।
ভোজ্য ছিল গুড় মুড়ি ভাত, পাত্র কলার পাতা,
শয্যা ছিল মলিন বালিস মাদুর ছেঁড়া-কাঁথা।

পরিধেয় সাজিমাটি-কাচা দুখান শাটি—
রোগের ওষুধ মাদুলি আর তুলসী তলার মাটি।
বাক্স তোরঙ ছিলনাকো, সামান্য যা পুঁজি,
পাওয়া যেত কড়ির ঝাঁপি কিংবা হাঁড়ি খুঁজি ॥
তবু আমি তাদের কথাই কই।
মাতামহীর দিদি তারা পিতামহীর সই!
তাদের কথা বলতে আমি শৈশবে যাই চলে,
মায়ের কোলে ঘুম না এলে আসত তাদের কোলে।
ছন্দে আমি বন্দী করে রাখি তাদের কথা
তাদের আশা ভালোবাসা ভয় ভরসা ব্যথা।
চাইল তারা জীবন দিয়ে অনাগতের হিত
আজিকার এই ইমারতের মাটির তলার ভিত।
আজিকার এই মিহিন শাড়ির চরকা তাদের হাতে।
আজিকার এই সংস্কৃতির মকসো তালপাতাতে ॥
তাদের স্নেহের ঝরনা ধারা ঝরতো বারোমাস।
আজো এ গায় দাগ রেখেছে তাদের বাহু-পাশ,
লজ্জা তাদের সজ্জা হয় কান্তি দিল দেহে,
সেবা তাদের ধর্ম ছিল, বিদ্যা ছিল স্নেহে।
হাতে তাদের তালের পাখা, ভরা কলস কাঁখে,
রান্নাঘরের ধোঁয়া তাদের রঙ দিল দুই আঁখে।
গৃহাশ্রমের তপস্বিনী, তাদের তপের ফলে
সভ্য বলে গণ্য মোরা হলাম ধরাতলে।
ক্ষয়ে যাওয়া তাদের শাঁখা ঘর্মঝরা-পাতে,
আজকে হল সোনার ঘড়ি মহিলাদের হাতে।
তাদের শোণিত ধারাই আজো বইছে কপা[illegible]রে,
ভুলে তাহা চলবে কেন? ভুলে তা বর্বরে।
খড়ো ঘরের লক্ষ্মী তারা যষ্ঠী বটের ছায়
প্রণাম জানাই পাদুকাহীন তাদের ধূলিপায় ॥

রচনাকাল ১৯৬২

রুদ্রলীলা

একে যবে অন্যে হানে, প্রাণ হরে, তখন হন্তারে
    দণ্ডিত করিতে চাই, দায়ী করি তারে।
লক্ষ-লক্ষ মরে যবে, আসে যবে মনের মড়ক,
লক্ষ-লক্ষ খুনী যবে করে তোলে ধরারে নরক,

একের আদেশে কিংবা দশের ইঙ্গিতে
লক্ষ-লক্ষ সর্বস্বান্ত সহস্রের হয় প্রাণ দিতে,
তখন মানুষে আর দায়ী করা সাজে?
মহামারী, ভূমিকম্প, বন্যাসম আপনারি কাজে
মানুষে লাগায়ে কর সহস্রের জীবন হরণ,
তুমি রুদ্র, মানুষ থাকে না "কর্তা" সে হয় "করণ"।
বৃথা তব স্তুতিস্তব-আরাধনা, বাছে না ভৈরব
পাপী বা নিষ্পাপে, ভক্ত-অভক্তেরে তোমার তাণ্ডব।
এমনি করিয়া তুমি নিজ সৃষ্টি করিছ বিনাশ,
প্রশ্বাসে গড়েছ যারে ধ্বংস করে তারেই নিঃশ্বাস।
গড়া আর নিজ হাতে ভেঙে-ভেঙে ফেলা—
এই তব লীলা, রুদ্র, এই তব চিরন্তনী খেলা,
নূতন করিয়া তাই গড়া
অভিনব বিধ্বংসের আয়োজন করা।
এই সত্য গূঢ়,
বুঝে না যে খুঁজে না যে সেই মায়ামূঢ়।
দয়াধর্ম স্নেহ-প্রীতি মানুষেরই মায়ার সৃজন ;
তোমার মাঝারে হেরে মায়ামূঢ় জন।
মানব হৃদয়
তোমাতে আরোপ করি বানায়েছে তোমা দয়াময়।
বিপন্ন তোমারে ডাকে শরণ্য ভাবিয়া অহরহ ;
এ অসত্য তুমি নাহি সহ।
মানুষের পশুত্ব ইহাই,
বক্ষে শরাহত হয়ে ব্যাধের শরণ মাগে তাই।
তারাই বর্বর,
তোমার উপরে, রুদ্র, করে যারা এখনো নির্ভর।

রচনাকাল ১৯৬৫

অন্নপূর্ণা

এ নব বঙ্গে আবার জননী তোমারে বরণ করি।
নব বঙ্গের মাটি দিয়া তব অঙ্গ প্রতিমা গড়ি।
নূতন করিয়া গড় মা এ দেশ,
পরাও তাহারে সাধকের এ বেশ,
অপমান লাজ বিজাতীয় সাজ সবলে লও মা হরি।

ফিরাও আবার সরল উদার শান্ত জীবন খানি
মন্দির হতে কুবেরে তাড়ায়ে তুমি রও বীণাপাণি।
আবার ভারতে ফিরুক সেদিন
তবেই ভারত হইবে স্বাধীন,
মুক্তি কোথায় মন যদি রয় বিদেশি শিকল পরি?

রচনাকাল ১৯৬৬

সত্যপথ

সত্যপথ কর সার, না বুঝিয়া গুণ তার
ধুলা দেবে আজ যারা গায়,
একদিন তাহারাই, হতাশ হয়ো না ভাই
ধুলা নেবে তোমার ও-পায়।
সবুর করিয়া রও যে যা বলে সবি সও.
ছেড়নাকো যারে জানো খাঁটি,
দেরিতে ফলিবে বলি না ধরিতে ফুল-কলি
পোঁতা গাছ্ কেবা ফেলে কাটি?
যে দিন ফুটিবে ফুল সবার ভাঙিবে ভুল
বিঁধিছে আজিকে হেন যারা
তায় মধুরস পেয়ে তাহারাই যশ গেয়ে
হরষে হইবে মাতোয়ারা ॥

রচনাকাল ১৯৬৬

আমন্ত্রণী

এসোগো—শ্যাম বনমালী কাননে অলক দুলায়ে।
হেথা যে—দোল লেগেছে খোল বেজেছে পাখির কুলায়ে।
কুহুর ঐ—পিচকারিতে রঙ্-ঝরনা পিকপতি ছুটায়।
সহকার—লাল পরাগের ফাগ ছুড়িছে মঞ্জুরী-মুঠায়।
সারিকা—নটকোনাতে ফট্‌ফরিয়ে কুমকুমি ফুটায়।
মহুয়া—ভার নিয়েছে চোখ রাঙাবার নেশায় ঢুলায়ে ॥

মধুতে—রঙ গুলে মৌ-বন রেখেছে অশোক শিমুলে,
চাঁচরের—আঙ্‌রাগুলো ভোমরা হয়ে কিংশুকে বুলে,
দখিনা—হিন্দোলাতে দোল হানে বনবালারা দুলে,
হরিণী—কস্তুরী বাসে দেবে গোঠ-গোধন ভুলায়ে ॥

যশোদা—মায় ছেড়ে হেথায় আসিতে ভয় কি নীলমণি?
মাধবী—চুম দিয়ে খাওয়াবে বঁধূ ফুলমথা ননী।
শিখীরা—ঘাম হলে ঢুলাবে গায়ে পাখার ব্যজনী,
শাখীরা—ঘুম পেলে ঘুমঘোর ঘনাবে আঙুল বুলায়ে ॥

রচনাকাল ১৯৬৬

নিভিবার আগে

বাণী দেবতার মন্দির তলে জ্বলিতেছে দীপাবলী
হাজারে-হাজারে তাদের মাঝারে আমিও এখনো জ্বলি।
মাটির প্রদীপ এক কোণে রই
আয়ুর তৈল বাকি আর কই
আমি জ্বলি-নিভি তাতে কিবা আসে যায়।

শলিতা আমার এখন নিভিতে চায়
কুটির চন্দ্র কুটিরেই শোভা পায়।

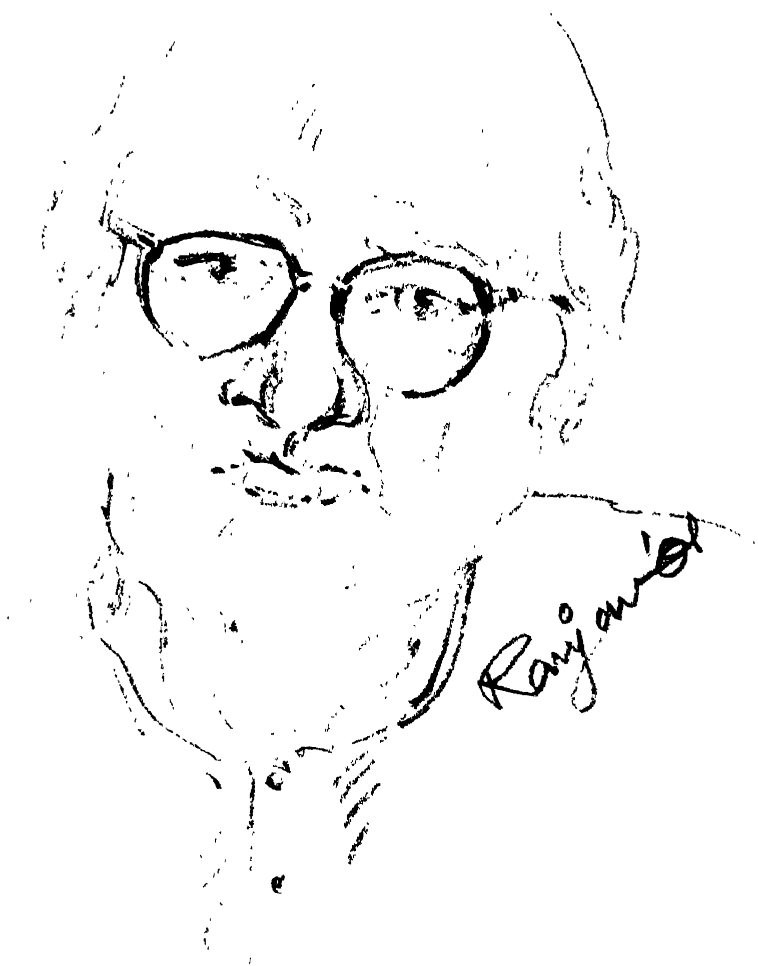
এ নহে আমার ঠাঁই
হেথায় লজ্জা কুণ্ঠাই শুধু পাই।
দহিছে এখন বুকের শলিতা সহি তায় বড় ব্যথা
নিভিবার আগে এখন আমার ক্ষণিক উজ্জ্বলতা;
এখন বৃথাই জ্বলি
রেখে যেতে হেথা একটুকু ধূমভস্মের কুণ্ডলি।

রচনাকাল ১৯৬৭

দিদিমার বিদায় আশীর্বাদ

চাঁদু আমার চাঁদু
আয় কাছে আয় দাদু।
গা ছুঁয়ে তুই বলেছিলি আমায় বারংবার
ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আমি নেব তোমার ভার।
সবাই এতে হাসল বটে নয় তা অবাস্তব
চৌদ্দ বছর বাঁচলে পরে হতো তা সম্ভব।
চোদ্দ বছর দূরে থাকুক চোদ্দ দিনও আর
বাঁচার আমার নেইকো অধিকার।
দশ বছরের ছেলের মুখে সরল মধুর কথা
দেয় আমারে ব্যথা।
বিদায় নেব সঙ্গে করি তাহার অঙ্গীকার
ঐ কথাতেই ঘনীভূত আমার এ সংসার।
মিটল না মোর সাধ
রেখে গেলাম আমার আশীর্বাদ।
নিতে হবে না তো সেবার আপন দিদিমার
বহিস্ যেন নতুন নতুন ভারের উপর ভার।
জানি আমি নিশ্চয়ই তুই ইঞ্জিনিয়ার হবি
দুই দাদুরই মতন যেন হোস্ বড় এক কবি।
এমনি করে সবার ভবলীলার অবসান
দুদিন আগে দুদিন পিছে থোবাই ব্যবধান।
এমনি করে বিদায় নিয়ে যায় দুনিয়ায় সবে
অমর হয়ে রয়েছে আর কেবা কোথায় কবে?
কাঁদিসনাকো উঠে বসার শক্তি আমার নাই,
আয় বাছাধন কাছে সরে একটা চুমো খাই।

রচনাকাল ১৯৬৭



জীবনীপঞ্জি

জন্ম : বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে রাঢ়ী বৈদ্য-বংশে ১৮৮৯ সালের ২২ জুন (বাংলা ১২৯৬ সনের ৭ আষাঢ়) কালিদাস রায়ের জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষের আদিবাস বর্ধমান জেলার কোগ্রাম (উজানি)। বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি লোচনদাস ঠাকুর তাঁর পূর্বসূরি এবং বৈষ্ণব-সাধক উদ্ধব দাস মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ। কালিদাস রায়ের প্রপিতামহ শিবচন্দ্র ও পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র যশোহর জেলার বামনডাঙার মেকেঞ্জি-সাহেবের নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। তাঁর পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় কাশিমবাজার রাজ-এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন। মাতা রাজবালা দেবী।

শিক্ষা : শৈশবে প্রথম পাঁচ বছর পিতার কর্মস্থল কাশিমবাজারে অতিবাহিত করে কাটোয়া মহকুমার কড়ুই গ্রামের বাড়িতে আসেন। গ্রামের পাঠশালায় শশী দৈবজ্ঞের কাছে তাঁর শিক্ষারম্ভ। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-স্কুলেও (এম.ভি. স্কুল) কিছুদিন পড়েন। পরে ওই স্কুলটি মাইনর স্কুলে (এম.ই. স্কুল) পরিণত হলে সেখানে তাঁর ইংরেজি শিক্ষার শুরু। মাইনর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ১৯০১ সালে কাশিমবাজারের খাগড়া-লন্ডন-মিশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯০৬ সালে ওই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে সরকারি বৃত্তি-সহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দর্শনে বি.এ. পড়েন এবং ১৯১১ সালে ডিস্টিংসন সহ বি.এ. পাশ করেন। বহরমপুর কলেজে পাঠরত অবস্থায় কাশিমবাজারের পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রীর চতুষ্পাঠীতে কিছু সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেন। বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ-তে ভর্তি হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

বিবাহ : ১৯১২ সালে (ফাল্গুন-পূর্ণিমায়) ডালটনগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র ভূপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের কন্যা সুকৃতি দেবীর সঙ্গে বিবাহ। তাঁদের চার পুত্র—ভবভূতি, জয়দেব, কবিরঞ্জন ও কবিকঙ্কণ এবং তিন কন্যা—কবিতা, সংগীতা ও গ্লপ্তিতা।

কর্মজীবন : শিক্ষকতাই তাঁর জীবিকা। বিভিন্ন স্কুলে ১৯১২ সাল থেকে ১৯৫৩—এই দীর্ঘ সময় তিনি শিক্ষকতা করেছেন। ১৯১২ সালে রংপুর জেলার উলিপুর গ্রামের মহারানী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষকরূপে তাঁর শিক্ষকতা শুরু। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কলকাতার বড়িশা হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে সহকারী শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং দীর্ঘ ২২ বছর সেখানে শিক্ষকতা করে ১৯৫৩ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পরিণত বয়সে কবি বাংলাদেশে সর্বজন-পরিচিত লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রায় সমস্ত বাংলা পত্র-পত্রিকাতেই তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে কলকাতার টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়' নামে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। সেখানে তৎকালীন বহু প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের সমাবেশ হত। তিনি তাঁদের সকলেরই 'দাদা' হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

সাহিত্যসৃষ্টি : কাব্যগ্রন্থ ॥ কুন্দ (১৯০৮); কিশলয় (১৯১১); পর্ণপুট (১৯১৪); বল্লরী (১৯১৫); পর্ণপুট (প্রথম খন্ড : পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৩৪); ব্রজবেণু (১৯১৫); ঋতুমঙ্গল (১৯১৬); পর্ণপুট (দ্বিতীয় খন্ড : ১৯২১); ক্ষুদকুঁড়া (১৯২৩); রসকদম্ব (১৯২৩), লাজাঞ্জলি (১৯২৫); চিত্তচিতা (১৯২৭); আহরণী (প্রথম সংস্করণ : ১৯২৮); আহরণী (দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৩০); হৈমন্তী (১৯৩৪); বৈকালী (১৯৪০); আহরণী (নবপর্যায়) আহরণ (১৯৫০); সন্ধ্যামণি (১৯৫৮); গাথাঞ্জলি (১৯৬১); দন্তরুচি-কৌমুদী (১৯৬১); কবিশেখর কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬৪); গাথা-কাহিনী (১৯৬৪); পূর্ণাহুতি (১৯৬৮); তৃণদল (১৯৭০), গাথামঞ্জরী (১৯৭৪); মণীষী-বন্দনা (১৯৭৬); গাথাবলী (১৯৭৮); দিনফুরানোর গান (১৯৮৪); কাঁটাফুলের গুচ্ছ (১৯৯২)।

কিশোর-সাহিত্য ॥ রামায়ণ (১৯২৯); কুরুরাজ (১৯৩৬); কথামালিকা (১৯৩৬); ভক্তমালিকা (১৯৩৭); জাতক-

মালিকা (১৯৩৭); প্রাথমিক ধর্মবোধ (১৯৩৯); ভক্তের ভগবান, গল্পমালিকা, ছেলেদের মহাভারত, লঙ্কেশ্বর, পুরাকাহিনী (১৯৫০); পুরাণ-কথিকা (১৯৫৪); জাতকের গল্প (১৯৫৫); জাতক-কাহিনী, গল্পমাল্য, পুরাণ-কাহিনী (১৯৫৫); গল্পকাহিনী (১৯৭৫); গল্প বলি শোনো (১৯৭২); পুরাতনী, সোনার পরশ (১৯৮২)।

গদ্য-সাহিত্য॥ সাহিত্য-প্রসঙ্গ (১ম ও ২ খন্ড); বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ খন্ড); বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড); পদাবলী-সাহিত্য; শরৎ-সাহিত্য (১ম ও ২য় খন্ড); চালচিত্র; চণক-সংহিতা; রঙ্গচিত্র-শরৎসান্নিধ্যে।

অনুবাদ-সাহিত্য॥ গীত-গোবিন্দ; গীতা-লহরী; কাব্যে শকুন্তলা; ইন্দুমতী (রঘুবংশ); কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ব্রজবাঁশরি।

পত্রিকা-সম্পাদনা : 'বসুধারা' (১৩৩৫ আশ্বিন ১৩৩৬ আষাঢ়), 'রসচক্র' ও 'মিলনী'।

সম্মান-লাভ : ১৯২০—রংপুর সাহিত্য-পরিষদ থেকে 'কবিশেখর' উপাধি লাভ।

১৯৪৭—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লীলা-লেকচার' প্রদান।

১৯৫৩—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্য-সাধনার জন্য 'জগত্তারিণী-পদক' লাভ।

১৯৬৩—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে গবেষণার জন্য 'সরোজিনী-স্বর্ণপদক' এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার জন্য 'আনন্দ-পুরস্কার' লাভ।

১৯৬৬—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডি.এল.রায়-লেকচার' দান।

১৯৬৮—'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্যে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ।

১৯৭০—বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ।

১৯৭২—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-লিট' উপাধি লাভ।

১৯৭৬—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মরণোত্তর 'ডি-লিট' সম্মান লাভ।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে কবিকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে একাধিকবার জনসংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

পরিশেষ :

কবির জীবনে যেমন খ্যাতি ও সম্মান লাভ ঘটেছে তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে শোক ও বিপর্যয় এসেছে। ১৯৬৮ সালে সহধর্মিণীর মৃত্যু ও জামাতা জগৎমোহন সেনের অকাল-মৃত্যু কবির হৃদয়কে একান্ত বিহ্বল করে। ১৯৭৫ সালের ২৫ অক্টোবর ৮৬ বছর বয়সে নিজ বাসভবন 'সন্ধ্যার কুলায়'-এ তাঁর দেহান্ত ঘটে। 'বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি জুঁই এর বনে/বিদায় নিল সজল চোখে নও-বসন্তের কনে।...কবির যত পুঁজি-পাটা বিদায় নিল সবি/তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।'

উৎস নির্দেশ :

কবিশেখর কালিদাস রায় জীবদ্দশায় তাঁর কবিতা নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর একই কবিতা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ভিন্ন নামে (কোথাও বা পরিবর্তিত অর্থাৎ পরিবর্ধিত, পরিবর্জিত, পরিমার্জিত হয়ে) একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এই সংকলনে নির্বাচিত কবিতাগুলি প্রথম যে-গ্রন্থে এসেছিল সেখানে রাখলেও, তাদের কালিদাস রায়ের জীবিতকালের সর্বশেষ পাঠই গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। সে-সবক্ষেত্রে কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতাটি গৃহীত তা বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হল।

কুন্দ (১৯০৮)— কুন্দ (শ্রেষ্ঠ কবিতা), আগমনী (ক্ষুদ্রকুঁড়া), গৃহলক্ষ্মী (আহরণ),শাশ্বত সত্য (বল্লরী, ২য় সং), তুলসী, অনুতাপ ও অশ্রু (আহরণী,২য় সং),

কিশলয় (১৯১১)— মরণ-গৌরব, তপ ও জ্ঞান, পলিত ও ললিত, চারিটি উপমা (আহরণী, ২য় সং), ভক্তি ও ঘৃণা, অপ্রবুদ্ধ উপভোগ (কিশলয়);

পর্ণপুট (১৯১৪)— দুর্বাসা (শ্রেষ্ঠ কবিতা), মথুরায় দূত (সন্ধ্যামণি), বৃন্দাবন অন্ধকার (শ্রেষ্ঠ কবিতা), পাদমেকং ন গচ্ছামি (সন্ধ্যামনি), কৃষাণীর ব্যথা (আহরণী, ২য় সং), ভূতো বাড়ি (আহরণী, ১য় সং), অলির প্রতি কুসুম (সন্ধ্যামণি), মন্দিরে না সিন্ধুনীরে, পালামৌ (আহরণ), চিরমিলন, বিরহতপের শেষ, রূপ ও ধূপ, পল্লীবালা, পাহাড়িয়া প্রিয়া (পর্ণপুট, ৫ম সং), শেফালি, রাঙাচুড়ি (আহরণ) হা-ঘরে. কুড়ানি, ভাদুরানী এসো ঘরে, বয়সন্ধি, প্রেমের স্মৃতি, রাখালরাজ, প্রিয়ার কৈশোর, ভূষণ, সম্পূর্ণতা (পর্ণপুট ৫ম সং)

বল্লরী (১৯১৫)— বিশ্বরূপ (বল্লরী), দূর্বা, সংগীত ও মাধুরী, জ্ঞান ও প্রেম প্রকৃত লক্ষণ, মধ্যপথে, দেবতার মুক্তি, প্রকৃত অর্ঘ্য, রৌদ্ররস, হাসির ফুল, জীবন ও মরণে, তীর্থ, পুষ্পিত কাল, সত্যসাধনা (আহরণী ২য় সং) ;

ব্রজবেণু (১৯১৫)— চিরবন্দ্য (ব্রজবেণু), লুকোচুরি (আহরণী, ২য় সং) চিরশ্যাম, চিরবন্দী, চিরবন্ধু, দীনবন্ধু, পুরাকথা, কুঞ্জভঙ্গ (ব্রজবেণু)

ঋতুমঙ্গল (১৯১৬)— ঋতুসংহার ও কুমারসম্ভব (আহরণী, ২য় সং) ,ঝুলন (আহরণ), চূতমঞ্জরী (আহরণী, ২য় সং), ভাদরে (আহরণ), ঋতুলক্ষ্মী (ঋতুমঙ্গল)

পর্ণপুট (২য় খন্ড। ১৯২১)—চন্দন ঘষার গান (আহরণী, ১ম সং), কালোরূপ (সন্ধ্যামণি), পতিতা, প্রিয়ার চিঠি, মঙ্গল-চন্ডী, প্রদীপের পুনর্জন্ম, শেষ (পর্ণপুট,২য়খন্ড) ;

ক্ষুদকুড়া (১৯২৩)— বঙ্গভূমি, বেরা-রোধসি (রেবাটতের স্মৃতি—শ্রেষ্ঠ কবিতা), ইউসুফের প্রতি জুলেখা, প্রেমের তত্ত্ব, মিলনোৎকণ্ঠিতা (ক্ষুদকুড়া) ;

রসকদম্ব (১৯২৩)— বঞ্চিত, ঘৃতং পিবেৎ (শ্রেষ্ঠ কবিতা), পেটের দায়, লঙ্কা মরিচ, নস্য, প্রশস্তি (রসকদম্ব) ;

লাজাঞ্জলি (১৯২৫)— চিরসুন্দর, বৌ-দিদি (আহরণী, ২ম সং), কবীরের প্রার্থনা (লাজাঞ্জলি), যৌবন-প্রশস্তি (শ্রেষ্ঠ কবিতা), টবের গাছ, বন্ধ্যার খেদ, প্রথম পরিচয় (লাজাঞ্জলি)

চিত্তচিতা (১৯২৭)— নির্বাচিত কবিতাগুলি 'চিত্তচিতা' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।

আহরণী (১ম সং। ১৯২৮)—ছাত্রধারা, শরতের ব্যথা, পঞ্চশর (শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আহরণী (২য় সং। প্রথমখন্ড ১৯৩০)—মথুরার দ্বারে, ছত্রবিয়োগে (শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আহরণী (২য় সং। দ্বিতীয়খন্ড ১৯৩০)—নির্বাচিত কবিতাগুলি ঐ কাব্যগ্রন্থথেকে গৃহীত।

হৈমন্তী (১৯৩৪)— পল্লী-শ্রী (আহরণ), তত্ত্ব ও রস, অকালের পাখি, শরতের গ্রামপথে, ছায়া (হৈমন্তী)

বৈকালী (১৯৪০)— যৌবন বিদায়, বিদ্যালয়-পথে (শ্রেষ্ঠ কবিতা), গোপী যন্ত্র, বৈশ্বানর (আহরণ), দুর্দিনের বন্ধু (বৈকালী), বৈশাখী সন্ধ্যায় (শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আহরণ (১৯৫০)— গাগরিভবণ (শ্রেষ্ঠ কবিতা), কবিতার দিন, বাংলার দিঘি (আহরণ)

সন্ধ্যামণি (১৯৫৮)— নির্বাচিত কবিতাগুলি ঐ কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত

দন্তরুচি কৌমুদী (১৯৬১)—কেরানির রানী, গাধা, চৌপদি (শ্রেষ্ঠ কবিতা), তোমরা ও আমরা, নেশাখোরের অভিযান (দন্তরুচি কৌমুদী)

'গাথা কাহিনী' (১৯৬৪), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৬৪), 'পূর্ণাহুতি' (১৯৬৮), গাথাঞ্জলি (১৯৬৪), তৃণদল (১৯৭০), 'দিন ফুরানোর গান' (১৯৮৪), কাঁটাফুলের গুচ্ছ (১৯৯২), তথাগত (১৯৯৪) কাব্য-গ্রন্থগুলির নির্বাচিত কবিতাগুলি সেই সেই গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

অগ্রন্থিত-কবিতা—কবিতাগুলি কবির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত।